গোরস্থানে সাবধান

(১৯৭৭)

ফেলুদা – সত্যজিত রায়

০১. রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক জটায়ু ওরফে লালমোহন গাঙ্গুলী

রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক জটায়ু ওরফে লালমোহন গাঙ্গুলীর লেখা গল্প থেকে বম্বের ফিল্ম পরিচালক পুলক ঘোষালের তৈরি ছবি কলকাতার প্যারাডাইজ সিনেমায় জুবিলি করার ঠিক তিন দিন পরে বিকেল বেলা উৎকট সারেগামা হর্ন বাজিয়ে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড মার্ক টু অ্যাম্বাসডর গাড়ি আমাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। আমরা জানতাম যে লালমোহনবাবু একটা গাড়ি কেনার তাল করছেন, কিন্তু ঘটনাটা যে এত চট করে ঘটে যাবে সেটা ভাবিনি। অবিশ্যি শুধু যে গাড়িই কেনা হয়েছে তা নয়; তার সঙ্গে একটি ড্রাইভারও রাখা হয়েছে, কারণ লালমোহনবাবু গাড়ি চালাতে জানেন না। এমনকী শেখার ইচ্ছেটাও নেই। একথাটা তিনি এতবার আমাদের বলেছেন যে, শেষটায় এক'দিন ফেলুদাকে বাধ্য হয়ে জিজ্ঞেস করতে হল, কেন মশাই, শিখবেন না কেন? তাতে লালমোহনবাবু বললেন যে, বছর পাঁচেক আগে নাকি এক বন্ধুর গাড়িতে শিখতে আরম্ভ করেছিলেন। দুদিন শিখে থার্ড দিনে একটা চমৎকার গল্পের প্লট মাথায় নিয়ে ফাস্ট গিয়ার থেকে সেকেন্ড গিয়ারে যেতে গাড়িটা এমন হ্যাঁচকা মারলে যে প্লটের খেই বেমালুম হাওয়া।সে-আপশোস আমার আজও যায়নি মশাই।

সাদা শার্ট আর খাকি প্যান্ট-পরা ড্রাইভার নেমে এসে দরজা খুলে দিতে লালমোহনবাবু একটা ছোট্ট লাফ দিয়ে রাস্তায় নামতে গিয়ে ধুতির কোঁচায় পা আটকে খানিকটা বেসামাল হলেও তাঁর মুখ থেকে হাসিটা গেল না! ফেলুদা কিন্তু গভীর। তিনজনে ঘরে এসে বসার পর সে মুখ খুলল।

আপনার ওই বিটকেল হর্নটা পালটিয়ে সাধারণ, সভ্য হর্ন না-লাগানো পর্যন্ত রজনী সেন রোডে ও-গাড়ির প্রবেশ নিষেধ।

জটায়ু জিভা কাটলেন। আমি জানতুম ব্যাপারটা একটু রিস্কি হয়ে যাচ্ছে। যখন ডিমনস্ট্রেট করলে না?—তখন লোভ সামলাতে পারলুম না।–জাপানি, জানেন তো?

কান-ফ্যাটানি হাড়-জ্বালানি, বলল ফেলুদা। আপনার উপর হিন্দি ফিল্মের প্রভাব এতটা ঝটিতি পড়বে সেটা ভাবতে পারিনি। আর রংটাও ইকুয়্যালি পীড়াদায়ক। মাদ্রাজি ফিল্ম-মার্কা।

লমোহনবাবু কাতরভাবে হাত জোড় করলেন।দোহাই মিস্টার মিত্তির! হর্ন আমি কালই চেঞ্জ করছি, কিন্তু রংটা রাখতে দিন। গ্রিনটা বড় সুদিং।

ফেলুদা হাল ছেড়ে দিয়ে চায়ের অর্ডার দিতে যাচ্ছিল, লালমোহনবাবু বাধা দিয়ে বললেন, ওটা এখন বাদ দিন, আগে চলুন। একবারটি চক্কর মেরে আসি। আপনাকে আর তপেশীবাবুকে না-চড়ানো অবধি আমার ঠিক স্যাটিস ফ্যাকশন হচ্ছে না। বলুন কোথায় যাবেন।

ফেলুদা আপত্তি করল না। একটু ভেবে বলল, তোপ্সেকে একবার চার্নকের সমাধিটা দেখিয়ে আনব ভাবছিলাম।

চার্নক? জব চার্নক?

না।

তবে? চার্নক আরও আছে নাকি?

আরও নিশ্চয়ই আছে, তবে কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা চার্নক একজনই।

তাই তো— মানে...

তার নাম জব নয়, জোব। জব হল কাজ, চাকরি; আর জোব হল নাম। যে ভুলটা আর পাঁচজনে করে সেটা আপনি করবেন কেন?

এখানে বলে রাখি ফেলুদার লেটেস্ট নেশা হল পুরনো কলকাতা। ফ্যান্সি লেনে একটা খুনের তদন্ত করতে গিয়ে ও যখন জানল যে ফ্যান্সি হচ্ছে আসলে ফাঁসি, আর ওই অঞ্চলেই দুশো বচ্ছর আগে নন্দকুমারের ফাঁসি হয়েছিল, তখন থেকেই নেশাটা ধরে। গত তিন মাসে ও এই নিয়ে যে কত বই পড়েছে, ম্যাপ দেখেছে, ছবি দেখেছে তার ইয়ত্তা নেই। অবিশ্যি এই সুযোগে আমারও অনেক কিছু জানা হয়ে যাচ্ছে, আর তার বেশির ভাগটা হয়েছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে দুটো দুপুর কাটিয়ে।

ফেলুদা বলে দিল্লি-আগ্রার তুলনায় কলকাতা খোকা-শহর হলেও এটাকে উড়িয়ে দেওয়া মোটেই ঠিক নয়। এখানে তাজমহল নেই, কুতুবমিনার নেই, যোধপুর-জয়সলমীরের মতো কেল্লা নেই, বিশ্বনাথের গলি নেই—এ সবই ঠিক-কিন্তু ভেবে দ্যাখ তোপ্‌সে—একটা সাহেব মশা মাছি সাপ ব্যাঙ বন-বাদাড়ে ভরা মাঠের এক প্রান্তে গঙ্গার ধারে বসে ভাবল এখানে সে কুঠির পত্তন করবে, আর দেখতে দেখতে বন-বাদাড় সাফ হয়ে গিয়ে সেখানে দালান উঠল, রাস্তা হল, রাস্তার ধারে লাইন করে গ্যাসের বাতি বসল, সেই রাস্তায় ঘোড়া ছুটল, পালকি ছুটল, আর একশো বছর যেতে না যেতে গড়ে উঠল এমন একটা শহর যার নাম হয়ে গেল সিটি অফ প্যালেসেজ। এখন সে শহরের কী ছিরি হয়েছে সেটা কথা নয়; আমি বলছি। ইতিহাসের কথা। শহরের রাস্তার নাম পালটে এরা সেই ইতিহাস মুছে ফেলতে চাইছে—কিন্তু সেটা কি উচিত? বা সেটা কি সম্ভব? অবিশ্যি সাহেবরা তাদের সুবিধের জন্যই এত সব করেছিল, কিন্তু যদি না করত, তা হলে ফেলুমিত্তির এখন কী করত ভেবে দ্যাখ! ছবিটা একবার কল্পনা করে দ্যাখ— তোর ফেলুদা—প্রদোষচন্দ্র মিত্র, প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর—ঘাড় গুঁজে কলম পিশছে কোনও জমিদারি সেরেস্তায়, যেখানে ফিংগার প্রিন্ট বললে বুঝবে টিপসই।

বিবিডি বাগা—যার নাম ছিল ডালহৌসি স্কোয়ার—যে ডালহৌসি আমাদের দেশে লাটসাহেব হয়ে এসে গপগপ রাজ্য গিলেছে, আর সেই সঙ্গে প্রথম রেলগাড়ি আর প্রথম টেলিগ্রাফ চালু করেছে—সেই বিবিডি বাগে দুশো বছরের পুরনো সেন্ট জনস চার্চের কম্পাউন্ডে কলকাতার প্রথম ইটের বাড়ি জোব চার্নকের সমাধি দেখে লালমোহনবাবু যদিও বললেন থ্রিলিং, আমার কিন্তু মনে হল সেটা আকাশে মেঘের ঘনঘটা আর সেই সঙ্গে একটা গুরু-গভীর গর্জনের জন্য। সমাধির গায়ে একটা মার্বেলের ফলকের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ভদ্রলোক বললেন, এ তো দেখছি জোবও নয় মশাই-জোবাসা ব্যাপার কী বলুন তো?।

জোবুস হল জোবের ল্যাটিন সংস্করণ, বলল ফেলুদা। পুরো লেখাটাই ল্যাটিনে সেটা বুঝতে পারছেন না?

ল্যাটিন-ফ্যাটিন জানি না মশাই; ইংরেজি নয় এটা বুঝতেই পারছি। নামের উপর ডি-ও—এম লেখা কেন?

ডি-ও—এম হচ্ছে ডমিনুস অমনিউম ম্যাজিস্টের। অর্থাৎ ঈশ্বর সকলের কর্তা। আর তার নীচে যে কথাগুলো রয়েছে তার একটার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। Marmore! মর্মর-সৌধ জানেন তো? সেই মর্মর আর এই মারমোরে একই জিনিস-মার্বল। আর আরও মজা হচ্ছে এই যে, মর্মর কথাটা সংস্কৃত নয়, ফারসি। অথচ সৌধ হল সংস্কৃত। এইভাবে সংস্কৃত-ফারসি সংস্কৃত-আরবি আমরা দিব্যি জোড়া লাগিয়ে চালিয়ে দিই। যেমন, শলাপরামর্শ। শল্যা হল সলাহ–অর্থাৎ পরামর্শ, ফারসি কথা: পরামর্শ সংস্কৃত। বা কাগজপত্র-কাগজ আরবি, পত্র সংস্কৃত। তারপর আবার—

ফেলুদার লেকচার শেষ হল না, কারণ কথা নেই বার্তা নেই উঠল এমন এক ধুলোর ঝড় (জটায়ু বললেন প্রলয়ঙ্কর) যেমন আমি আর কোনওদিন দেখিনি। আমরা পড়ি-কি-মারি করে লালমোহনবাবুর সবুজ অ্যামবাসডরে গিয়ে উঠলাম, আর ড্রাইভার হরিপদবাবু গাড়ি ছুটিয়ে দিলেন এসপ্ল্যানেডের দিকে। এই প্রথম দেখলাম ধুলোর জন্য অকাটার—থুড়ি—শহিদ মিনারটা আর দেখা যাচ্ছে না। হাওয়ার তেজ কত বুঝতে পারছি না। কারণ গাড়ির কাচ তুলে দেওয়া হয়েছে। তবে এটা দেখলাম যে, চানাচুরওয়ালারা যে সরু লম্বা বেতের মোড়ার মতো স্ট্যান্ডের উপর তাদের জিনিসপত্র রাখে, তারই একটা গড়ের মাঠের দিক থেকে শূন্য দিয়ে পাক খেতে খেতে উড়ে এসে আমাদের ঠিক সামনে একটা চলন্ত ডবল ডেকারের দোতলায় আছড়ে পড়ে পরীক্ষণেই আবার ছাড়া পেয়ে কার্জন পার্কের দিকে উড়ে গেল।

পার্ক স্ট্রিটের কাছাকাছি এসে দেখি ট্রাম বন্ধ, কারণ একটা দেবদারু গাছ ভেঙে লাইনের উপর পড়েছে, ফেলুদার ইচ্ছে ছিল আমাদের পার্ক স্ট্রিটের পুরনো গোরস্থানটা দেখিয়ে নিয়ে যাবে, কিন্তু সেটা আর এই ঝড়ের জন্য হল না! যদি যেতাম, তা হলে হয়তো একটা ঘটনা চোখের সামনে দেখতে পেতাম।–যেটার বিষয় পরদিন সকালে কাগজে বেরোল। চব্বিবশে জুনের এই প্রলয়ঙ্কর ঝড়ে (উইন্ড ভেলসিটি ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড ফটিফাইভ কিলোমিটার্স পার আওয়ার) সাউথ পার্ক স্ট্রিট গোরস্থানে একটা গাছ ভেঙে পড়ে নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস নামে এক গ্রৌঢ় ভদ্রলোককে গুরুতরভাবে জখম করে। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবিশ্যি তিনি সন্ধ্যাবেলা এই আদ্যিকালের গোরস্থানে কী করছিলেন সে খবর কাগজে লেখেনি।

০২. দুপুরের অর্ধেকটা বাদলার উপর দিয়েই গেল

পরদিন সকাল আর দুপুরের অর্ধেকটা বাদলার উপর দিয়েই গেল। ফেলুদা কেত্থেকে জানি একটা ১৯৩২ সালের ক্যালকাটা অ্যান্ড হাওড়ার ম্যাপ জোগাড় করেছে; দুপুরে খিচুড়ি আর ডিম ভাজা খেয়ে পান মুখে পুরে একটা চারমিনার ধরিয়ে ও ম্যাপটার ভাঁজ খুলল। সেটাকে মাটিতে বিছনোর জন্য টেবল চেয়ার সব ঠেলে দেয়ালের গায়ে লাগিয়ে দিয়ে মেঝের মাঝখানে ছ-ফুট বাই ছ-ফুট জায়গা করতে হল। ম্যাপের উপর হামাগুড়ি দিয়ে আমরা কলকাতার রাস্তাঘাট দেখছি, ফেলুদা বলছে রাজনী সেন খুজিস না, এ অঞ্চলটা তখন জঙ্গল, এমন সময় জটায়ু এলেন। আজ আর ধুতি-পাঞ্জাবি নয়, গাঢ় নীল টেরিকটের প্যান্ট আর হলুদে বুশ শার্ট। ছিয়াত্তরটা গাছ পড়েছে কালকের ঝড়ে ঢুকেই ঘোষণা করলেন ভদ্রলোক। আর আপনার কথা রেখেছি মশাই, এখন আর হর্ন শুনলে হিন্দি ফিল্মের কথা মনে পড়বে না।

আজ তাড়া নেই, তাই চা খেয়ে বেরোনো হল। ছিয়াত্তরটা গাছ পড়ার খবর কাগজে পড়ে বিশ্বাস হয়নি, কিন্তু পার্ক স্ট্রিট থেকে নিজের চোখে উনিশটা গাছ বা গাছের ডাল পড়ে থাকতে দেখলাম, তার মধ্যে সাদার্ন এভিনিউতেই তিনটে। তাও তো এর মধ্যে কত ডালপালা সরিয়ে ফেলা হয়েছে কে জানে।

গোরস্থানের গেটের সামনে যখন পৌঁছলাম (এখানে আসছি সেটা ক্যামাক স্ট্রিটের আগে ফেলুদা আমাদের বলেনি) তখন জটায়ুর দিকে চেয়ে দেখি তাঁর স্বাভাবিক ফুর্তি ভাবটা যেন একটু কম। ফেলুদা তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিতে ভদ্রলোক বললেন, একবার এক সাহেবকে কবর দিতে দেখেছিলুম—ফর্টিওয়ানে— রাঁচিতে। কাঠের বাক্সটা গর্তে নামিয়ে যখন তার উপর চাবড়া চাকড়া মাটি ফেলে না—সে এক বীভৎস শব্দ মশাই।

সে শব্দ এখানে শোনার কোনও সম্ভাবনা নেই, বলল ফেলুদা।এই গোরস্থানে গত সোয়াশো বছরে কোনও মৃতব্যক্তিকে সমাধিস্থ করা হয়নি।

গেট দিয়ে ঢুকতেই ডাইনে দারোয়ানের ঘর। দিনের বেলা যে-কেউ এ গোরস্থানে ঢুকতে পারে, তাই দারোয়ানের বোধহয় বিশেষ কোনও কাজ নেই। তবে হ্যাঁ, বলল ফেলুদা। একটা ব্যাপারে একটু নজর রাখতে হয়-যাতে সমাধির গা থেকে কেউ মার্বেলের ফলক খুলে না। নেয়। ভাল ইটালিয়ান মার্বেল বাজারে বিক্রি করলে বেশ দু পয়সা আসে।–দারোয়ান!

দারোয়ান ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দেখে বলে দিতে হয় না সে বিহারের লোক, খৈনিটা মনে হয়। সবেমাত্র পুরেছে মুখে।

কাল এখানে একজন বাঙালিবাবু জখম হয়েছেন-মাথায় গাছ পড়ে?

হাঁ বাবু।

সে জায়গাটা দেখা যায়?

উয়ো রাস্তাসে সিধা চলিয়ে যান—একদম এন্ড তক। বাঁয়ে ঘুমলেই দেখতে পাবেন। অভিতক পড়া হুয়া হ্যায় পেড়।

আমরা তিনজন ঘাস-গজিয়ে-যাওয়া বাঁধানো রাস্তাটা দিয়ে এগিয়ে গেলাম। দুদিকে সমাধির সারি-তার এক-একটা বারো-চোদ্দো হাত উঁচু। ডাইনে কিছু দূরে একটা সমাধি প্রায় তিনতলা বাড়ির সমান উঁচু। ফেলুদা বলল, ওটা খুব সম্ভবত পণ্ডিত উইলিয়াম জোনস-এর সমাধি, ওর চেয়ে উঁচু সমাধি নাকি কলকাতায় আর নেই।

প্রত্যেকটা সমাধির গায়ে সাদা কিংবা কালো মার্ব্বেলের ফলকে মৃতব্যক্তির নাম, জন্মের তারিখ, আর মৃত্যুর তারিখ, আর সেই সঙ্গে আরও কিছু লেখা। কয়েকটা বড় ফলকে দেখলাম অল্প কথায় জীবনী পর্যন্ত লেখা রয়েছে। বেশির ভাগ সমাধিই চারকোনা থামের মতো, নীচে চওড়া থেকে উপরে সরু হয়ে উঠেছে। লালমোহনবাবু সেগুলোকে বললেন বোরখাপরা ভূত। কথাটা খুব খারাপ বলেননি, যদিও এ ভূতের নড়াচড়ার উপায় নেই। এ ভূত প্রহরী ভূত; মাটির নীচে কফিনবন্দি হয়ে যিনি শুয়ে আছেন তাঁকেই যেন গার্ড করছেন এই ভুত। এই স্তম্ভগুলোর ইংরিজি নামটা জেনে রাখ তোপ্‌সে। একে বলে ওবেলিস্ক। লালমোহনবাবু বার পাঁচেক কথাটা আউড়ে নিলেন। আমি বাঁ দিক ডান দিক চোখ ঘোরাচ্ছি। আর ফলকের নামগুলো বিড়বিড় করছি—জ্যাকসন, ওয়াটুস, ওয়েলস, লারকিনস, গিৰনস, ওল্ডহ্যাঁম...। মাঝে মাঝে দেখছি পাশাপাশি একই নামের বেশ কয়েকটি সমাধি রয়েছে।–বোঝা যাচ্ছে সবাই একই পরিবারের লোক। সবচেয়ে আগের তারিখ যা এখন পর্যন্ত চোখে পড়েছে তা হল ২৮ শে জুলাই ১৭৭৯।

তার মানে ফরাসি বিপ্লবেরও বারো বছর আগে।

রাস্তার শেষ মাথায় পৌঁছে বুঝতে পারলাম গোরস্থানটা কত বড়। পার্ক স্ট্রিটের ট্র্যাফিকের শব্দ এখানে ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ফেলুদা পরে বলেছিল, এখানে নাকি দু হাজারের বেশি সমাধি আছে। লালমোহনবাবু লোয়ার সাকুলার রোডের দিকটায় গোরস্থানের গায়ে-লগা একটা ফ্ল্যাটবাড়ির দিকে, দেখিয়ে বললেন, ওঁকে লাখ টাকা দিলেও নাকি উনি ওখানে থাকবেন না।

গাছ যেটা ভেঙেছে বলে কাগজে বেরিয়েছে, সেটা আসলে শাখা-প্রশাখা সমেত একটা প্রকাণ্ড আম গাছের ডাল। সেটা পড়েছে একটা সমাধির বেশ খানিকটা ধ্বংস করে। এ ছাড়াও আরও অনেক ডালপালা চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে।

আমরা সমাধিটার দিকে এগিয়ে গেলাম।

এটা অন্যগুলোর তুলনায় বেঁটে, লালমোহনবাবুর কাঁধ অবধি আসবে বড় জোর। বোঝা যায় এমনিতেই সেটার অবস্থা বেশ কাহিল ছিল। যেদিকে ডালের ঘা লাগেনি সেদিকটাও ফাটল ধরে চৌচির হয়ে আছে, পলেস্তারা খসে ইট বেরিয়ে আছে। ঘা লাগার দরুন শ্বেত পাথরের ফলকটাও ভেঙেছে, তার খানিকটা সমাধির গায়ে এখনও লেগে আছে, বাকিটা আট-দশ টুকরো হয়ে ঘাসের উপর পড়ে আছে। বৃষ্টি হয়ে চারিদিকটা এমনিতেই জলকাদায় ভরা, কিন্তু এখানে যেন কাদাটা অন্য জায়গার চেয়ে একটু বেশি। আশ্চর্য, বললেন লালমোহনবাবু, গড কথাটা কিন্তু এখনও সমাধির গায়ে লেগে আছে।

শুধু গড নয়, বলল ফেলুদা, তার নীচে সালের অংশ দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই।

ইয়েস। ওয়ান এইট-ফাইভ-তারপর ভাঙা বোঝাই যাচ্ছে এই গড হল আপনার সেই ঈশ্বর সকলের কতা-র গড।

তাই কি?

ফেলুদার প্রশ্ন শুনে তার দিকে চাইলাম। তার ভুরু কুঁচকোনো। বলল, আপনি অন্য সমাধিগুলো বিশেষ মন দিয়ে দেখেননি দেখছি। দেখুন না। ওই পাশেরটার দিকে।

পাশেই আরেকটা বড় সমাধি রয়েছে। তার ফলকে লেখা–

To the Meriory of
Capt. P. O’reilly, H. M., 44th Regt.
who died 25th May, 1823 aged 38 years

লক্ষ করুন, নামের নীচেই আসছে সাল-তারিখ। বেশির ভাগ ফলকেই তাই। আর, গড় কথাটা অন্য কোনও ফলকে দেখলেন কি?

ফেলুদা ঠিকই বলেছে। এই পথটুকু আসার মধ্যে আমি নিজেই অন্তত ত্রিশটা ফলকের লেখা পড়েছি, কিন্তু কোনওটাতেই গড় দেখিনি।

তার মানে বলছেন, গড় হল মৃতব্যক্তির নাম?

গড কারুর নাম হয় বলে আমার মনে হয় না, যদিও ঈশ্বর বা ভগবান নামটা হিন্দুদের মধ্যে আছে। লক্ষ্য করুন, গড-এর জি-এর বা দিকে ইঞ্চি-খানেক ফাঁক দেখা যাচ্ছে–অর্থাৎ বাঁ দিকে ওর গায়ে গায়ে কোনও অক্ষর ছিল না। কিন্তু ডি-এর ডান দিকটায় ফাঁক আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না-কারণ সে-জায়গায় পাথরটা ভেঙে পড়ে গেছে। আমার ধারণা এটা যার কবর তার পদবির প্রথম তিনটে অক্ষর হল জি-ও-ডি; যেমন গডফ্রি বা গডার্ড।

সে তো পাথরের টুকরোগুলো জড়ো করে পাশাপাশি-

লালমোহনবাবু কথাটা বলতে বলতে ভাঙা ডালপালার উপর দিয়ে সমাধিটার দিকে এগিয়ে তার ধারে পৌছোতেই হঠাৎ সাড়াৎ করে খানিকটা নীচের দিকে নেমে গেলেন। গর্তে পা পড়লে যেমন হয় ঠিক তেমনি। কিন্তু ফেলুদা ঠিক সময়ে তার লম্বা হাত দুটি বাড়িয়ে তাঁকে খপ করে ধরে টেনে তুলে শক্ত জমিতে দাঁড় করিয়ে দিল? ব্যাপারটা কী? ওখানে গর্ত হল কী করে? কেমন যেন খটকা লাগছিল, বলল ফেলুদা, ভাঙল আমগাছ, অথচ আমপাতার সঙ্গে জাম-কাঁঠাল কী করছে তাই ভাবছিলাম।

লালমোহনবাবু এমনিতেই গোরস্থানে এসে একটু গুম মেরে গিয়েছিলেন, তার উপর এই ব্যাপার। প্যান্টের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে এ একটু বাড়াবাড়ি মশাই বলে ভদ্রলোক একপাশে সরে গিয়ে আমাদের দিকে পেছন করে বোধ হয় নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করলেন।

তোপ্‌সে—খুব সাবধানে ডালপালাগুলো সরা তো।

আমি আর ফেলুদা গর্ত বাঁচিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করতেই বেশ বোঝা গেল কবরের পাশটায় হাত-খানেক গভীর খালের মতো রয়েছে। সেটা আগেই ছিল, না সম্প্রতি কেউ খুঁড়ে করেছে সেটা ফেলুদা বুঝে থাকলেও, আমি বুঝলাম না।

ফেলুদা এবার মার্বেলের টুকরোগুলোয় মন দিল। দুজনে মিলে এগারোটা টুকরো জড়ো করে মিনিট দশেক ঘাসের উপর জিগ-স পাজল খেলে সেগুলোকে ঠিক ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিলাম। তার ফলে জিনিসটা এইরকম দাঁড়াল—

Sacred to the Memory of
THOMAS –WIN
Obt. 24th April—8, AET. 180—

গডউইন, বলল ফেলুদা, টমাস গডউইনের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে। ওবিটি হল ওবিটুস অর্থাৎ মৃত্যু, আর এই টি হল এই টাটিস অর্থাৎ বয়স। এখন কথা হচ্ছে—

ও মশাই!

জটায়ু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে আমাকে বেশ চমকে দিলেন। ঘুরে দেখতেই ভদ্রলোক একটা চৌকো চ্যাপটা কালো জিনিস আমাদের দিকে তুলে ধরে বললেন, সাঁইত্রিশ টাকায় বু-ফক্সে তিনজনের ডিনার হবে কি?

কী পেলেন ওটা?

আমরা দুজনেই বেশ আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে গেলাম।

লালমোহনবাবুর বাঁ হাতে একটা কালো মানিব্যাগ, আর ডান হাতে তিনটে দশ, একটা পাঁচ, আর একটা দুটাকার নোট। টাকা আর ব্যাগ দুটোরই অবস্থা বেশ শোচনীয়। ভদ্রলোকের ভয় কেটে গিয়ে এখন একটা বেশ মারদিস ভাব; বেশ বুঝতে পারছেন যে, ফেলুদার জন্য একটা ভাল ক্লু জোগাড় করে দিয়েছেন।

ফেলুদা ব্যাগটা খুলে খাপগুলোর ভিতর যা ছিল সব বার করল। চার রকম জিনিস বেরোল খাপ থেকে। এক নম্বর—এক গোছা ভিজিটিং কার্ড, যাতে ইংরিজিতে লেখা এন এম বিশ্বাস। ঠিকানা টেলিফোন নেই। ফেলুদা বলল, দেখেছেন খবরের কাগজের কাণ্ড-নরেন্দ্রমাহনকে। নরেন্দ্রনাথ করে দিয়েছে।

দুই নম্বর হচ্ছে দুটো খবরের কাগজের কাটিং। একটাতে এই সাউথ পার্ক স্ট্রিটে গোরস্থান। প্রথম যখন খুলল তার খবর, আর আরেকটাতে আজকাল যাকে শহিদ মিনার বলি, সেই অকটারলোনি মনুমেন্ট তৈরি হবার খবর। তার মানে দুটো কাগজের টুকরোই দেড়শো-দুশো ॥ বছরের পুরনো। বিশ্বেস মশাই এত প্রাচীন কাগজের কাটিং কোথেকে জোগাড় করলেন জানতে ভারী কৌতুহল হচ্ছে— মন্তব্য করল ফেলুদা।

তিন নম্বর হচ্ছে পার্ক স্ট্রিটের অক্সফোর্ড বুক কোম্পানির একটা বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সার ক্যাশমেমো; আর চার হল একটুকরো সাদা কাগজ, যাতে ডট পেনে ইংরিজিতে কয়েকটা লাইন লেখা। লেখার মাথামুণ্ডু বুঝলাম না, যদিও ভিক্টোরিয়া নামটা পড়তে পেরেছিলাম।

অকটারলোনি মনুমেন্ট নিয়ে যে একটা লেখা সেদিন কাগজে, হঠাৎ বলে উঠলেন লালমোহনবাবু, আর যদ্দূর মনে পড়ছে লেখকের পদবি ছিল বিশ্বাস। হ্যাঁ—বিশ্বাস। কারেক্ট।

কোন কাগজ? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

হয় লেখনী না হয় বিচিত্রপত্র। ঠিক মনে পড়ছে না। আমি বাড়ি গিয়ে চেক করব।

জটায়ুর স্মরণশক্তি তেমন নির্ভরযোগ্য নয় বলেই বাধ হয় ফেলুদা এ ব্যাপারে। আর কিছু না বলে সাদা কাগজের লেখাটা তার নিজের নেটবুকে কপি করে নিয়ে আসল কাগজ আর অন্য জিনিসগুলো মানিব্যাগে ভরে সেটা পকেটে নিয়ে নিল। তারপর মিনিট পাঁচেক ধরে কবরের আশপাশটা ভাল করে দেখে আরও দুটো জিনিস পেয়ে সেগুলোও পকেটে পুরল। সে-দুটো হচ্ছে একটা ব্রাউন রঙের কোটের বোতাম আর একটা নেতিয়ে যাওয়া রেসের বই।–চল, দারোয়নের সঙ্গে একবার কথা বলে বেরিয়ে পড়ি। আবার মেঘ করল!

ব্যাগটা কি ফেরত দেবেন? জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু।

অবিশ্যি। কোন হাসপাতালে আছে খোঁজ করে কাল একবার যাব।

আর সে-লোক যদি মরে গিয়ে থাকে?

সেই অনুমান করে তো আর তার প্রপার্টি আত্মসাৎ করা যায় না। সেটা নীতিবিরুদ্ধ। —আর সাঁইত্রিশ টাকায় ব্লু-ফক্সে তিনজনের চা-স্যান্ডউইচের বেশি কিছু হবে না, সুতরাং আপনি ডিনারের আশা ত্যাগ করতে পারেন।

আমরা আবার উলটা মুখে ঘুরে কবরের সারির মাঝখানের পথ দিয়ে গেটের দিকে এগোতে লাগলাম। ফেলুদা গভীর। এরই ফাঁকে একটা চারমিনার ধরিয়ে নিয়েছে। এমনিতে ও সিগারেট অনেক কমিয়ে দিয়েছে। কিন্তু রহস্যের গন্ধ পেলে নিজের অজান্তেই মাঝে সাঝে সাদা কাঠি মুখে চলে যায়।

অর্ধেক পথ যাবার পর সে হঠাৎ থামল কেন সেটা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারিনি। তারপর তার চাহনি অনুসরণ করে একটা জিনিস দেখে আমার হাঁটার হার্টবিটটাও সঙ্গে সঙ্গে এক পলকের জন্য থেমে গোল।

একটা গম্বুজওয়ালা সমাধি—যার ফলকে মৃতব্যক্তির নাম রয়েছে মিস মারগারেট টেম্পলটন-তার ঠিক সামনে ঘাসে পড়ে থাকা একটা পুরনো ইটের উপর একটা সিকিখাওয়া জ্বলন্ত সিগারেট থেকে সরু ফিতের মতো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠছে। বৃষ্টি হবে বলেই বোধহয় বাতাসটা বন্ধ হয়েছে, না হলে ধোঁয়া দেখা যেত না।

ফেলুদা এগিয়ে গিয়ে দুইঞ্চি লম্বা সিগারেটটা তুলে নিয়ে মন্তব্য করল, গোল্ড ফ্লেক। জটায়ু বলল, বাড়ি চলুন। আমি বললাম, একবার খুঁজে দেখব লোকটা এখনও আছে কি না?

সে যদি থাকত, বলল ফেলুদা, তা হলে সিগারেট হাতে নিয়েই থাকত; কিংবা হাত থেকে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে নিবিয়ে দিত। আধখাওয়া অবস্থায় এভাবে ফেলে যেত না। সে লোক পালিয়েছে, এবং বেশ ব্যস্তভাবেই পালিয়েছে।

দারোয়ান ঘরে ছিল না। মিনিট তিনেক অপেক্ষা করার পর সে পশ্চিম দিকের একটা ঝোপের পিছন থেকে বেরিয়ে হেলতে দুলতে এগিয়ে এসে বলল, আভি এক চুহাকো খতম। করা দিয়া।

বুঝলাম, ওই ঝোপের পিছনে চুহার সৎকার সেরে তিনি ফিরছেন, ফেলুদা কাজের কথায় চলে গেল।

যার উপর গাছ পড়েছিল তাকে জখম অবস্থায় প্রথম দেখল কে?

দারোয়ান বলল যে সেই দেখেছিল। গাছ পড়ার সময়টা সে গোরস্থানে ছিল না, তার নিজের একটা শার্ট উড়ে গিয়েছিল পার্ক স্ট্রিটে, সেটা উদ্ধার করতে গিয়েছিল। ফিরে এসে ব্যাপারটা দেখে। দারোয়ান ভদ্রলোকের মুখ চিনত, কারণ উনি নাকি সম্প্রতি আরও কয়েকবার এসেছেন। গোরস্থানে।

আর কেউ এসেছিল কালকে?

মালুম নেহি বাবু। হাম যাব দৌড়কে গিয়া, উস টাইমামে তো আউর কোই নেহি থা।

এইসব সমাধির পিছনে লুকিয়ে থাকতে পারে তো?

এটা দারোয়ান অস্বীকার করল না। আমারও মনে হচ্ছিল যে এই গোরস্থানের চেয়ে ভাল লুকোচুরির জায়গা বোধহয় সারা কলকাতায় আর একটিও নেই।

নরেন বিশ্বাসের অবস্থা দেখে দারোয়ান রাস্তায় বেরিয়ে এসে এক পথচারী সাহেবকে খবরটা দেয়। বর্ণনা থেকে মনে হল সেন্ট জেভিয়ার্সের ফাদার-ব্রাদার হতে পারে। তিনিই নাকি ট্যাক্সি ডাকিয়ে নরেন বিশ্বাসকে হাসপাতালে পাঠানোর বন্দোবস্ত করেন।

আজ একটু আগে কাউকে আসতে দেখেছিলে?

আভি?

হ্যাঁ?

না, দারোয়ান কাউকে আসতে দেখেনি। সে গেটের কাছে ছিল না। সে গিয়েছিল চুহার লাশ নিয়ে ওই ঝোপড়াটার পিছনে। ওটা ফেলে দিয়েই ওর কাজ শেষ হয়নি, কারণ একটু পিপাসার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

রাত্রে তুমি এখানে থাক?

হাঁ বাবু। লেকিন রাতকো তো পাহারেক কেই জরুরৎ নেহি হাতা। ডর কে মারে কোই আতাহি নেহি। পহলে লোয়ার সারকুলার রোড সাইডমে দিওয়ার টুটা থা, লেকিন আজকাল স্নাতকো কোই নেহি আতা সমনিটরিমে।

তোমার নাম কী?

বিরামদেও!

এই নাও।

সালাম বাবু।

দারোয়নের হাতে দুটাকার নোটটা গুঁজে দেবার ফল অবিশ্যি আমরা পরে পেয়েছিলাম।

০৩. টমাস গডউইন

গডউইন...? টমাস গডউইন...?

সিধুজ্যাঠার কপালে ছটা খাঁজ পড়ে গেল।

সিধুজ্যাঠাকে আমি বলি বিশ্বকোষ, ফেলুদা বলে শ্রুতিধর। দুটোই ঠিক। একবার যা পড়েন, একবার যা শোনেন- মনে ধরলে ভোলেন না। ফেলুদাকে মাঝে মাঝে ওঁর কাছে আসতেই হয়। যেমন আজকে। ভোরে উঠে হাঁটতে বেরোন সিধুজ্যাঠা লেকের ধারে। মাইল দু-এক হেঁটে বাড়ি ফিরে আসেন সাড়ে ছাঁটার মধ্যে। বৃষ্টি হলেও বাদ নেই, ছাতা নিয়ে বেরোবেন। বাড়ি ফিরে সেই যে তক্তপোষের উপর বসেন, এক স্নান-খাওয়া ছাড়া ওঠা নেই। সামনে একটা ডেস্ক, তার উপর বই, ম্যাগাজিন, খবরের কাগজ। লেখেন না। চিঠিও না, ধোপার হিসেবও না, কিছু না। খালি পড়েন। টেলিফোন নেই। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার দরকার হলে চাকর জনার্দনকে দিয়ে বলে পাঠান; দশ মিনিটে সে খবর পৌঁছে যায়। বিয়ে করেননি; বউ-এর বদলে বই নিয়ে ঘর করেন। বলেন, আমার সংসার, আমার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার। আমার ডাক্তার মাস্টার সিস্টার মাদার ফাদার, সবই আমার বই। পুরনো কলকাতা সম্বন্ধে ফেলুদার উৎসাহের জন্য সিধু জ্যাঠাই কতকটা দায়ী। তবে সিধুজ্যাঠা শুধু কলকাতা না। সারা বিশ্বের ইতিহাস জানেন।

দুধ-ছাড়া চায়ে পর পর দুটো চুমুক দিয়ে সিধু জ্যাঠা গডউইন কথাটা আরও দুবার আওড়ালেন। তারপর বললেন, গডউইন নামটা ফস করে বললে প্রথমটা শেলির শ্বশুরের কথাই মনে হয়, কিন্তু ভারতবর্ষে এসেছে এমন একটা গডউইনও ছিল বটে; কোন বছরে মারা গেছে বললে?

আঠারো শো আটান্ন।

আমার জন্ম?

সতেরো শো আটাশি।

হু, তা হলে এই গডউইন হতে পারে বটে। আটচল্লিশেই বোধ হয়, কিংবা উনপঞ্চাশে, ক্যালকাটা রিভিউতে একটা লেখা বেরিয়েছিল। টমাসের মেয়ে। নাম শার্লি। না না-শার্লট । শার্লট গডউইন। তার বাপ সম্বন্ধে লিখেছিল। হুঁ, মনে পড়েছে।... ওরেব্বাস! সে তো এক তাজ্জব কাহিনী হে ফেলু!—অবিশ্যি শেষ জীবনের কথা লেখেনি শার্লট। আর সেটা আমি জানিও না; কিন্তু গোড়ায় ভারতবর্ষে এসে তার কীর্তিকলাপ-সে তো একেবারে গল্পের মতো! তুমি তো লখনৌ গেছ ?”

ফেলুদা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। বাদশাহী আংটির ব্যাপারে প্রথম তার গায়েন্দাগিরির তারাবাজি লখনৌতেই দেখিয়েছিল ফেলুদা।

সাদত আলির কথা জানি তো?

জানি।

সেই সাদত আলি তখন লখনৌ-এর নবাব। দিল্লির পিদিম তখন নিবু-নিবু; যত রোশনাই সব লখনৌ-এ। সাদত ইয়াং বয়সে কলকাতায় ছিল, সাহেবদের সঙ্গে মিশে ইংরিজি ভাষাটা একটু ভাসাভাসা শিখেছিল, আর শিখেছিল ষোল আনা সাহেবিয়ানা। আসাফ-উদ-দ্দৌল্লা মারা যাবার পর ওয়জীর আলি হল নবাব। সাদত আলি তখন কাশীতে। মন খারাপ, কারণ আশা ছিল আসফের পর সেই গাঁদিতে বসবে। এদিকে ওয়জীর ছিল অকর্মর ঢেঁকি। ব্রিটিশরা তাকে বরদাস্ত করতে পারলে না; চার মাসে তার নবাবি দিলে বরবাদ করে। মনে রেখো। অযোধ্যায় তখন কোম্পানির প্রতিপত্তি খুব; নবাবরা কোম্পানির কথায় ওঠে বসে। ওয়জীরকে হটিয়ে তারা সাদতিকে সিংহাসনে বসাল। সাদত খুশি হয়ে ব্রিটিশকে অর্ধেক অযোধ্যা দিয়ে দিলে।

সে সময়ে লিখনৌ-এর অলিতে-গলিতে সাহেব। নবাবের ফৌজে সাহেব অফিসার, সাহেব গোলন্দাজ, তা ছাড়া সাহেব ব্যবসায়ী, সাহেব ডাক্তার, সাহেব পেস্টার, সাহেব নাপিত, সাহেব ইস্কুল মাস্টার; আবার কেউ কেউ আছে যারা এসেছে শুধু টাকার লোভে; নবাবের নেক নজরে পড়ে দু-পয়সা যদি কামাতে পারে। এই শেষ দলের মধ্যে পড়ে টমাস গডউইন। ইংলন্ডের ছোকরা–সাসেক্স না সাফোক না সারি কোথায় তার বাড়ি ঠিক মনে নেই-সে দেশে বসে নবাবির গল্প শুনে এসে হাজির হল লখনৌতে। সুপুরুষ চেহারা, কথাবার্তা ভাল, রেসিডেন্ট চেরি সাহেবের মন ভিজিয়ে তার কাছ থেকে সুপারিশপত্র নিয়ে গিয়ে হাজির হল নবাবের দরবারে। সাদত জিজ্ঞেস করলে, তোমার গুণাপনা কী। টমাস শুনেছে নবাব বিলিতি খানা পছন্দ করে- রান্নার হাত ভাল ছিল ছোকরার-বললে আমি ভাল শেফ, তোমাকে বেঁধে খাওয়াতে চাই। নবাব বললে খাওয়াও। ব্যস-গডউইন এমন রান্না রাঁধলে যে সাদত তক্ষুনি তাকে বাবুর্চিখানায় বাহাল করে নিলে। তারপর থেকে নবাব যেখানে যায়। সেখানেই মুসলমান বাবুর্চির পাশে পাশে যায়। টমাস গডউইন। লাটসাহেব শহরে এলে সাদত তাকে ব্রেকফাস্টে ডাকেসাহেব খুশি হলে সাদতের মঙ্গল-ভরসা। টমাস গডউইন। আর নতুন কোনও ডিশ পছন্দ হলেই আসে বকশিশ। নবাধি বকশিশ জানো তো ? দু-দশ টাকা কি দু-চারটে মোহর গুজে দেওয়া তো নয়—লখনৌ-এর নবাব! হাত ঝাড়লেই পর্বত। বুঝে দেখো, গডউইনের পকেট কীভাবে ফুলে-ফেঁপে উঠল। আর তাই যদি না হবে তো সে বাবুর্চিখানায় পড়ে থাকবে কেন ? সে রকম লোকই সে নয়।

বেরিয়ে এল নবাবের আওতা থেকে। চলে এল আমাদের এই কলকাতায়। এসেই বিয়ে করলে জেন ম্যাডক বলে এক মেমসাহেবকে—কোম্পানির ফৌজের এক ক্যাপ্টেনের মেয়ে। তার তিন মাসের মধ্যে এক রেস্টোরান্ট খুললে খাস চৌরঙ্গিতে। তারপর যা হয়। আর কী। সুদিন তো আর কারুর চিরটািকাল থাকে না। গড়উইনের ছিল জুয়োর নেশা। লখনৌ থাকতে মুরগির লড়াই আর তিতিরের লড়াইয়ে বাজি ফেলে যেমন কামিয়েছে তেমনি খুইয়েছে। কলকাতায় এসে সে রোগ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল।. এর বেশি আর তার মেয়ে কিছু লেখেনি। যদ্দূর মনে হয়, টমাস গডউইন মারা যাবার কয়েক মাস পরেই এ-লেখাটা বেরোয়। সেক্ষেত্রে তার নিজের মেয়ের পক্ষে তার বাপের মন্দ দিকটা কি আর খুব ফলাও করে লেখা চলে? অন্তত সে-যুগে যেত না নিশ্চয়ই। যাই হাক,

এশিয়াটিক সোসাইটিতে গিয়ে তুমি লেখাটা পড়ে দেখতে পারে। আমি যা বললাম। তার চেয়ে ন্যাচারেলি আরও বেশি ডিটেল পাবে।

আমার অবিশ্যি মনে হল, সিধুজ্যাঠা পুরো লেখাটাই বাংলা করে বলে ফেলেছেন।

ফেলুদা আর আমি দুজনেই টমাস গডউইনের এই আশ্চর্য কাহিনী শুনে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে কুইলাম। আমাদের আগে সিধুজ্যাঠাই আবার মুখ খুললেন।

কিন্তু টমাস গডউইনের বিষয় হঠাৎ জিজ্ঞেস করছ কেন? কী ব্যাপার?

ফেলুদা বলল, সেটা বলছি। তার আগে আরেকটা জিনিস জানার আছে। নরেন্দ্র বিশ্বাস বলে কারুর নাম শুনেছেন—যিনি পুরনো কলকাতা নিয়ে প্রবন্ধ-টবন্ধ লেখেন?

কীসে লেখেন?

তা জানি না।

কোনও অখ্যাত কাগজে লিখলে সে লেখা আমার চোখে পড়বে না। আজকাল আর ধরাবাঁধা কাগজের বাইরে আর কিছু পড়ি না। কিন্তু এ প্রশ্নই বা কেন?

ফেলুদা সংক্ষেপে কালকের ঘটনাটা বলে বলল, গাছ পড়ে যদি একটা লোক জখম হয়ে অজ্ঞান হয়, তা হলে তার মানিব্যাগটা দশ হাত দূরে ছিটকে পড়বে কেন, এইখানেই খটকা।

হুম...

সিধুজ্যাঠা একটু গভীর থেকে বললেন, কাল ঝড়ের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় নব্বই মাইল। যদি বেরোয় যে ভদ্রলোকের মানিব্যাগ তার শার্ট বা পাঞ্জাবির বুকপকেটে ছিল, তা হলে দৌড়ে পালাতে গিয়ে পকেট থেকে সে ব্যাগ ছিটকে পড়া কিছুই আশ্চর্য নয়। আর দৌড়ানোর অবস্থাতেই তার মাথায় গাছ পড়ে থাকতে পারে। তা হলে আর রহস্য কোথায়?

ভদ্রলোক পড়েছিলেন গডউইনের সমাধির পাশে।

তাতে কী এসে গেল?

সেই সমাধির পাশে খালের মতো গর্ত। মনে হয় কেউ খোঁড়ার কাজ শুরু করেছিল।

সিধুজ্যাঠার চোখ ছানাবড়া।

বল কী হে! গ্রেভ ডিগিং? এ তো ভারী গ্রেভ সংবাদ দিলে হে তুমি। এ তো অবিশ্বাস্য। টাটকা লাশ হলে খুঁড়ে বার করে শব ব্যবচ্ছেদের জন্য বিক্রি করে পয়সা আসে জানি। কিন্তু দুশো বছরের পুরনো লাশের কয়েকটা হাড়গোড় ছাড়া আর কী পাওয়া যাবে বলো! তার না। আছে প্রত্নতাত্ত্বিক ভ্যালু, না আছে রিসেল ভ্যালু। খুঁড়েছে সে ব্যাপারে তুমি শিওর?

পুরোপুরি নয়—কারণ বৃষ্টির জন্য কোদালের কোপের চিহ্ন মুছে গেছে—কিন্তু তবু...

সিধুজ্যাঠা আবার একটু ভেবে মাথা নেড়ে বললেন, না হে ফেলু, আমার মনে হচ্ছে তুমি বুনা হাঁসের পেছনে ধাওয়া. করছি। হাতে কোনও কেস-টেস নেই বুঝি? তাই কল্পনায় একটা রহস্য খাড়া করছি—অ্যাঁ?

ফেলুদা তার একপেশে হাসিটা হেসে চুপ করে রইল। সিধু জ্যাঠা বললেন, গডউইনের বংশের কেউ যদি এখানে থাকত তা হলে না হয় তাদের জিজ্ঞেস করে কিছু জানা যেত। কিন্তু সেও তো বোধহয় নেই। সব সাহেব পরিবারই তো আর বারওয়েল বা টাইটলার পরিবার নয়— যাদের কেউ না কেউ সেই ক্লাইভের আমল থেকে এই সেদিন অবধি ইন্ডিয়াতে কাটিয়ে গেছে।

এইবার ফেলুদা তার এতক্ষণের চাপা খবরটা দিয়ে দিল।

টমাস গডউইনের তিন পুরুষ পর অবধি তাদের কেউ না কেউ এ-দেশেই মারা গেছে সে খবর আমি জানি।

সে কী? সিধুজ্যাঠা অবাক। আসলে আজই সকালে এখানে আসার আগে আমরা লোয়ার সাকুলার রোড়ের গোরস্থানটা দেড় ঘণ্টা ধরে দেখে এসেছি। এটা পার্ক স্ট্রিট গোরস্থানের পরে তৈরি। আর এখনও ব্যবহার হয়।

শার্লট গডউইনের সমাধি দেখেছি, বলল ফেলুদা। ১৮৮৬ সালে সাতষট্টি বছর বয়সে মারা যান।

গডউইন পদবি দেখলে? তার মানে বিবাহ করেননি। আহা, বড় সুলেখিকা ছিলেন।

শার্লটের পাশে তার বড় ভাই ডেভিডের সমাধি। মৃত্যু ১৮৭৪ –ফেলুদা পকেট থেকে তার খাতাটা বার করে নোট দেখে দেখে বলে চলেছে—ইনি খিদিরপুরের কিড কোম্পানির হেড অ্যাসিসট্যান্ট ছিলেন। ডেভিডের পাশে তার ছেলে লেফটেনান্ট কর্নেল অ্যাভূ গর্ডউইন ও তার স্ত্রী এমা গডউইন। অ্যাণ্ডু মারা যান। ১৮৮২-তে। অ্যাভূ-এমার পাশে তাদের ছেলে চার্লস। ইনি ডাক্তার ছিলেন, মৃত্যু ১৯২০।

সাব্বাস! ধন্যি তোমার অনুসন্ধিৎসা আর অধ্যবসায়। সিধু জ্যাঠা সত্যিই খুশি হয়েছেন।এখন তোমার জানতে হবে বর্তমানে এঁদের কেউ জীবিত কি না এবং কলকাতায় আছেন কি না। টেলিফোন ডিরেক্টরিতে গডউইন নাম পেলে?

মাত্র একটি। ফোন করেছিলাম। এই পরিবারের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।

দেখো খোঁজ করে। হয়তো থাকতে পারে। অবিশ্যি তার হদিস কী করে পাবে তা জানি না। পেলে, আর কিছু না হাক-গ্রেভ ডিগিং-এর ব্যাপারটা আমার কাছে ভুয়ো বলেই মনে হয়— অন্তত টমাস গড়উইনের মতো একটা কালারফুল চরিত্র সম্বন্ধে হয়তো আরও কিছু তথ্য জোগাড় করতে পারে। গুড লোক!

০৪. দুপুর পর্যন্ত ধৈর্য ধরে

বাড়ি এসে দুপুর পর্যন্ত ধৈর্য ধরে তারপর ফেলুদাকে আর না জিজ্ঞেস করে পারলাম না।–

কাল যে নরেন বিশ্বাসের ব্যাগ থেকে একটা সাদা কাগঞ্জ বেরোল, তাতে কী লেখা ছিল?

নরেন বিশ্বাসের খাতাটা ফেলুদা বিকেলে ফেরত দিতে যাবে। সে খবর নিয়ে জেনেছে যে, ভদ্রলোক পার্ক হসপিটালে আছেন।

ফেলুদা তার খাতাটা খুলে আমার দিকে এগিয়ে দিল।

যদি এর মানে বার করতে পারিস তা হলে বুঝব নোবেল প্রাইজ তোর হাতের মুঠোয়।

খাতার রুল টানা পাতায় লেখা রয়েছে–

B/S 14 SNB for WG Victoria & P.C. (44?)

Re Victorias letters try MN, OU, GAA, S, WN

আমি মনে মনে বললাম, নোবেল প্রাইজটা ফসকে গেল। তাও মুখে বললাম, ভদ্রলোক কুইন ভিক্টোরিয়া সম্বন্ধে ইন্টারেস্টেড বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড পি সি টা কী ঠিক বুঝতে পারছি না।

পি সি বোধ হয় প্রিন্স কনসার্ট, তার মানে ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স অ্যালবার্ট।

আর কিছুই বুঝতে পারছি না।

কেন, ফর মানে জন্য আর ট্রাই মানে চেষ্টা বুঝলি না?

ফেলুদার মেজাজ দেখে বুঝলাম সেও বিশেষ কিছু বোঝেনি। সিধু জ্যাঠার কথাটা যে আমারও মনে ধরেনি তা নয়। ফেলুদা সত্যিই হয়তো যেখানে রহস্য নেই। সেখানে জোর করে রহস্য ঢোকাচ্ছে। কিন্তু তার পরেই মনে পড়ে যাচ্ছে কালকের সেই জ্বলন্ত সিগারেটটা, আর সঙ্গে সঙ্গে পেটের ভিতরটা কেমন যেন খালি হয়ে যাচ্ছে। আমরা আছি জেনে কে পালাল গোরস্থান থেকে? আর বাদলা দিনে সন্ধে করে সে সেখানে গিয়েছিলই বা কেন?

আগে থেকেই ঠিক ছিল যে চারটের সময় আমরা নরেন বিশ্বাসের ব্যাগ ফেরত দিতে যাব, আর লালমোহনবাবুই আমাদের এসে নিয়ে যাবেন। টাইমমাফিক বাড়ির সামনে গাড়ি থামার শব্দ পেলাম। ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন হাতে একটা পত্রিকা নিয়ে। কী বলেছিলুম মশাই? এই দেখুন বিচিত্রপত্র, আর এই দেখুন। নরেন বিশ্বাসের লেখা। সঙ্গে একটা ছবিও আছে মনুমেন্টের, যদিও ছাপেনি ভাল।

কিন্তু এও তো দেখছি, নরেন্দ্রনাথ বলছে, নরেন্দ্রমোহন তো নয়। তা হলে কি অন্য লোক নাকি?

আমার মনে হয় ভিজিটিং কার্ডেই গণ্ডগোল। বাজে প্রেসে ছাপানো। আর ভদ্রলোক হয়তো প্রুফও দেখেননি। কিন্তু ব্যাগের মধ্যে ওই কাটিং আর তার পর এই লেখা—ব্যাপারটা স্রেফ কাকতালীয় বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় কি?

ফেলুদা লেখাটায় চোখ বুলিয়ে পত্রিকাটা পাশের টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে বলল, ভাষা মন্দ না, তবে নতুন কিছু নেই। এখন জানা দরকার এই লোকই গাছ পড়ে জখম হওয়া নরেন বিশ্বাস কি না।

পার্ক হসপিটালের ডাঃ শিকদারকে বাবা বেশ ভাল করে চেনেন। আমাদের বাড়িতেও এসেছেন দু-একবার, তাই ফেলুদার সঙ্গেও আলাপ। ফেলুদা কার্ড পাঠানোর মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আমাদের ডাক পড়ল।

কী ব্যাপার? কোনও নতুন কেস-টেস নাকি?

ফেলুদা যেখানেই যে-কারণেই যাক না কেন, চেনা লোক থাকলে তবে এ প্রশ্নটা শুনতেই হয়।

ও হেসে বলল, আমি এসেছি। এখানের এক পেশেন্টকে একটা জিনিস ফেরত দিতে।

কোন পেশেন্ট?

মিস্টার বিশ্বাস। নরেন বিশ্বাস। পরশু—

সে তো চলে গেছে! এই ঘণ্টা দু-এক আগে। তার ভাই এসেছিল গাড়ি নিয়ে; নিয়ে গেছে।

কিন্তু কাগজে যে লিখল—

কী লিখেছে? সিরিয়াস বলে লিখেছে তো? কাগজে ওরকম অনেক লেখে। আস্ত একটা গাছ মাথায় পড়লে কি আর সে লোক বাঁচে? একটা ছোট ডাল, যাকে বলে প্রশাখা, তাই পড়েছে। জখমের চেয়ে শকটাই বেশি। ডান কবজিটায় চোট পেয়েছে, মাথায় কটা, স্টিচ— ব্যাস এই তো।

আপনি কি বলতে পারেন ইনিই পুরনো কলকাতা নিয়ে—

ইয়েস। ইনিই। একটা লোক সন্ধেবেলা গোরস্থানে ঘোরাঘুরি করছে, ন্যাচারেলি কৌতুহল হয়। জিজ্ঞেস করতে বললেন পুরনো কলকাতা নিয়ে চর্চা করছেন। তা আমি বললুম ভাল লাইন বেছেছেন; নতুন কলকাতাকে যতটা দূরে সরিয়ে রাখা যায় ততই ভাল।

জখমটা স্বাভাবিক বলেই মনে হল?

অ্যাই!... পথে আসুন বাবা। এতক্ষণে একটা গোয়েন্দা মাক প্রশ্ন হয়েছে!

ফেলুদা অপ্রস্তুত ভাবটা চাপতে পারলে না।

মানে, উনি নিজেই বললেন যে গাছ পড়ে...?

আরো মশাই, গাছটা যে পড়েছে তাতে তো আর ভুল নেই? আর উনি সেখানেই ছিলেন।

সন্দেহ করার কোনও কারণ আছে কি?

উনি নিজে অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক কিছু বলেননি তো?

মোটেই না। বললেন, চোখের সামনে দেখলাম গাছটা ভাঙল–তার ডালপালা যে কতখানি ছড়িয়ে আছে সেটা তো আর আঁচ করা সম্ভব হয়নি। তবে হ্যাঁ-ইয়েস-জ্ঞান হবার পরে উইল কথাটা দু-তিনবার উচ্চারণ করেছিলেন। এতে যদি কোনও রহস্য থাকে তো জানি না। মনে তো হয় না, কারণ উইলের উল্লেখ ওই একবারই; আর করেননি।

ভদ্রলোকের পুরো নামটা আপনার জানা আছে?

কেন, কাগজেই তো বেরিয়েছিল। নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

আরেকটা প্রশ্ন-বিরক্ত করছি, কিছু মনে করবেন না-ওনার পোশাকটা মনে আছে? বিলক্ষণ। শার্ট আর প্যান্ট। রংও মনে আছে-সাদা শার্ট আর বিস্কিটের রঙের প্যান্ট। গ্ল্যাক্সো না, ক্রিম ক্র্যাকার-হেঃ হেঃ!

ফেলুদা ডাঃ শিকদারের কাছে নরেন বিশ্বাসের ঠিকানা নিয়ে নিয়েছিল। আমরা নার্সিংহোম থেকে সটান চলে গেলাম নিউ আলিপুরে। ভারী ঝামেলা নিউ আলিপুরে ঠিকানা খুঁজে বার করা, কিন্তু জটায়ুর ড্রাইভার মশাইটি দেখলাম। কলকাতার রাস্তাঘাট ভালই চেনেন। বাড়ি বার করতে তিন মিনিটের বেশি ঘুরতে হয়নি।

দোতলা বাড়ি, দেখে মনে হয় পনেরো থেকে বিশ বছরের মধ্যে বয়স! গেটের সামনে রাস্তার উপর একটা কালো অ্যামবাসাডর দাঁড়িয়ে আছে, আর গেটের গায়ে দুটো নাম—এন বিশ্বাস ও জি বিশ্বাস। বেল টিপতে একজন চাকর এসে দরজা খুলে দিল।

নরেনবাবু আছেন কি? ফেলুদা প্রশ্ন করল।

তার তো অসুখ।

দেখা করতে পারবেন না? একটু দরকার ছিল।

কাকে চাই?

প্রশ্নটা এল চাকরের পিছন দিক দিয়ে। একজন চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরের ভদ্রলোক এগিয়ে এসেছেন। ফরসা রং, চোখ সামান্য কটা, দাড়ি-গোঁফ কামানো। পাজামার উপর বুশ শার্ট, তার উপর একটা মটকার চাদর জড়ানো। ফেলুদা বলল, নরেন বিশ্বাস মশাই-এর একটা জিনিস তাঁকে ফেরত দিতে চাই। ওঁর মানিব্যাগ, পকেট থেকে পড়ে গোসল পার্ক স্ট্রিট গোরস্থানে।

তাই বুঝি? আমি ওঁর ভাই। আপনার ভিতরে আসুন। দাদা বিছানায়। এখনও ব্যান্ডেজ বাঁধা। কথা বলছেন, তবে এ রকম অ্যাক্সিডেনটি...একটা বড় রকম ইয়ে তো।...

দোতলায় যাবার সিঁড়ির পিছন দিকে একটা বেডরুম, তাতেই নরেনবাবু শুয়ে আছেন। ভাইয়ের চেয়ে রং প্রায় দু-পোঁচ কালো, ঠোঁটের উপর বেশ একটা পুরু গোঁফ, আর মাথার ব্যান্ডেজটার নীচে যে টাক আছে সেটা বলে দিতে হয় না।

বাঁ হাতে ধরা স্টেটসম্যান কাগজটা নামিয়ে ভদ্রলোক ঘাড় হেঁট করে আমাদের নমস্কার জানালেন। ডান কবজিতে ব্যান্ডেজ, তাই হাত জোড় করে নমস্কারে অসুবিধা আছে। ভাইটি আমাদের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। শুনলাম চাকরকে হাঁক দিয়ে আরও দুটো চেয়ারের কথা বলে দিলেন। এ ঘরে রয়েছে একটিমাত্র চেয়ার, খাটের পাশে ডেস্কের সামনে।

ফেলুদা মানিব্যাগটা বার করে এগিয়ে দিল।

ও হা হা—অনেক ধন্যবাদ। আপনি আবার কষ্ট করে...

কষ্ট আর কী–ফেলুদা বিনয়ভূষণ–ঘটনাচক্রে ওখানে গিয়ে পড়েছিলাম, আমার এই বন্ধুটি কুড়িয়ে পেলেন, তাই...

নরেনবাবু এক হাতেই মানিব্যাগের খাপগুলো ফাঁক করে তার ভিতরে একবার চোখ বুলিয়ে ফেলুদার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন। গোরস্থানে...?

আমিও আপনাকে ঠিক ওই প্রশ্নই করতে যাচ্ছিলাম, ফেলুদা হেসে বলল, আপনি বোধহয় প্রাচীন কলকাতার ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনো করছেন?

ভদ্রলোক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

করছিলাম তো বটেই–কিন্তু যা ঘা খেলাম। মনে হয় পবনদেব চাইছেন না। আমি এ নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করি।

বিচিত্রপত্র কাগজে যে লেখাটা–

ওটা আমারই। মনুমেন্ট তো? আমারই। আরও লিখেছি। দু-একটা এখানে সেখানে। চাকরি করতাম, গত বছর রিটায়ার করেছি। কিছু তো একটা করতে হবে! ছাত্র ছিলাম ইতিহাসের। ছেলেবেলা থেকেই ওদিকটায় ঝোঁক।

কলেজে থাকতে বাগবাজার থেকে হেঁটে দমদম যাই ক্লাইভ সাহেবের বাড়ি দেখতে। দেখেছেন? এই সেদিন অবধি ছিল–একতলা বাংলো টাইপের বাড়ি, সামনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোট-অফ-আর্মস।

আপনি প্রেসিডেন্সিতে পড়েছেন?

খাটের ডান পাশেই টেবিল, আর তার দু-হাত উপরেই দেয়ালে একটা বাঁধানো গ্রুপ ছবিতে লেখা—

Presidency College Alumni Association 1953.

শুধু আমি কেন, বললেন নরেন বিশ্বাস, আমার ছেলে, ভাই, বাপ, ঠাকুর্দা সবাই প্রেসিডেন্সির ছাত্র। ওটা একটা ফ্যামিলি ট্রাডিশন। এখন বলতে লজ্জা করে–আমরা সোনার মেডেল পাওয়া ছাত্র–গিরীন, আমি, দুজনেই!

কেন, লজ্জা কেন!

কী আর করলুম বলুন জীবনে? আমি গেলাম চাকরিতে, গিরীন গেল ব্যবসায়। কে আর চিনল আমাদের বলুন?

ফেলুদা এগিয়ে গিয়েছিল। ছবিটা দেখতে। এবার তার দৃষ্টি নামল নীচের দিকে। টেবিলের উপর একটা নীল খাতা। সেটার প্রথম পাতাটা খোলা রয়েছে, দেখে বোঝা যাচ্ছে একটা লেখা শুরু হয়ে আট-দশ লাইনের বেশি এগোয়নি।

আপনার নাম কি নরেন্দ্রনাথ না নরেন্দ্রমোহন?

অ্যাজ্ঞে?

ভদ্রলোক বোধহয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। ফেলুদা আবার প্রশ্নটি করল। ভদ্রলোক একটু হেসে একটু যেন অবাক হয়ে বললেন, নরেন্দ্রনাথ বলেই তো জানি। কেন, আপনার কি সন্দেহ হচ্ছে?

আপনার ভিজিটিং কার্ডে দেখলাম এন এম বিশ্বাস রয়েছে।

ও হো! ওটা তো ছাপার ভুল। কাউকে কার্ড দেবার আগে ওটা কলম দিয়ে শুধরে দিই। অবশ্য নতুন কার্ড ছাপিয়ে নেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু গাফিলতি করে আর করিনি। আর সত্যি বলতে কী, আমাদের আর ভিজিটিং কার্ডের কী প্রয়োজন বলুন। ইদানীং মিউজিয়মটিউজিয়মের কতা-ব্যক্তিদের সঙ্গে একটু দেখা-টেখা করতে হচ্ছিল তাই ব্যাগে কয়েকটা ভরে নিয়েছিলাম। ভাল কথা-আপনিও কি ওই গোরস্থান নিয়ে লিখবেন-টিখবেন নাকি? আশা করি না! আপনার মতো ইয়াং রাইভ্যালের সঙ্গে কিন্তু পেরে উঠব না।

ফেলুদা যাবার জন্য উঠে পড়ে বলল, আমি লিখিটিখি না–শুধু জেনেই আনন্দ। ভাল কথা-একটা অনুরোধ আছে। পুরনো কলকাতা নিয়ে পড়াশুনা করতে গিয়ে যদি গডউইন পরিবারের কোনও উল্লেখ পান তা হলে অনুগ্রহ করে জানালে উপকার হবে।

গডউইন পরিবার?

টমাস গডউইনের সমাধি পার্ক স্ট্রিট গোরস্থানে রয়েছে। ইন ফ্যাক্ট, একই গাছ একসঙ্গে আপনাকে এবং গডউইনের সমাধিকে জখম করেছে।

তাই বুঝি?

আর সার্কুলার রোড গোরস্থানে গডউইন পরিবারের আরও পাঁচটা সমাধি রয়েছে।

অবিশ্যি জানাব। কিন্তু কোথায় জানাব? আপনার ঠিকনাটা?

ফেলুদা তার প্রাইভেট ইনভেসটিগেটর লেখা কার্ডটা নরেনবাবুর হাতে তুলে দিল।

এই আপনার পেশা নাকি? গোয়েন্দাগিরি? ভদ্রলোক বেশ একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কলকাতায় প্রাইভেট ডিটেকটিভ আছে বলে শুনেছি, কিন্তু চোখে দেখলাম এই প্রথম!

০৫. ভিক্টোরিয়ার কথাটা জিজ্ঞেস করলে

তুমি ভিক্টোরিয়ার কথাটা জিজ্ঞেস করলে না কেন? আমি ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করলাম গাড়িতে চৌরঙ্গির দিকে যেতে যেতে। আজ লালমোহনবাবু ধরেছেন ব্লু ফক্সে গিয়েই চা-স্যান্ডউইচ। খাওয়াবেন। কে জানত যে এই বুফক্সে গিয়েই ঘটনার মোড় ঘুরে যাবে!

ফেলুদা বলল, তার ব্যাগের কাগজপত্র আমি ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। সেটা জানলে কি ভদ্রলোক খুব খুশি হতেন? আর লেখাটা সাংকেতিক না হাক, সংক্ষিপ্ত ভাষায় তো বটেই। যদি কোনও গোপনীয় ব্যাপার হয়ে থাকে?

তা বটে।

লালমোহনবাবুকে একটু ভাবুক বলে মনে হচ্ছিল। ফেলুদাও সেটা লক্ষ করেছে। বলল, আপনার চোখে উদাস দৃষ্টি কেন?

ভদ্রলোক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, পুলক ছোকরার জন্য একটা ভাল প্লট ফেঁদেছিলুম। নির্ঘাত আকার হিট হত।–তা সে আজ লিখেছে। হিন্দি ছবিতে নাকি থ্রিল আর ফাইটিং-এর বাজারে মন্দা। সবাই নাকি ভক্তিমূলক ছবি চায়। জয় সন্তোষী মা সুপারহিট হবার ফলে নাকি এই হাল। ভেবে দেখুন!

তা আপনার মুশকিলটা কোথায়! ভক্তিভাব জাগছে না মনে?

লালমোহনবাবু কথাটার উত্তর দেবারও প্রয়োজন বোধ করলেন না। কেবল ভীষণ একটা অভক্তির ভাব করে দুবার হেল হেল বলে চুপ করে গেলেন। হেল বলার কারণ অবিশ্যি পুলক ঘোষালের চিঠি নয়। আমরা বিড়লা প্লানেটেরিয়াম ছাড়িয়ে চৌরঙ্গিতে পড়েছি, বাঁয়ে মাটির পাহাড় ময়দানটাকে আড়াল করে দিয়েছে। লালমোহনবাবু কিছুদিন থেকে পাতাল রেল না বলে হেল রেল বলছেন।

গাড়ি ক্রমাগত গাড়ায় পড়ছে আর লালমোহনবাবু শিউরে শিউরে উঠছেন। বললেন, স্ক্রিপ্রং যতটা খারাপ ভাবছেন ততটা নয়। চলুন রেড রোড দিয়ে, দেখবেন গাড়ির কোনও দোষ নেই।

তাও তো এখন রাস্তা পাকা, বলল ফেলুদা, দুশো বছর আগে এ রাস্তা ছিল গেয়ে কাঁচা। কল্পনা করে দেখুন।

তখন তো আর অ্যাম্বাসডর চলত না। আর এত ভিড়ও ছিল না।

ভিড় ছিল, তবে সে মানুষের নয়, হাড়গিলের!

হাড়গিলে?

সাড়ে চার ফুট লম্বা পাখি। রাস্তায় ময়লা খুঁটে খুঁটে খেতো এখন যেমন দেখছেন কাক চড়ুই, তখন ছিল হাড়গিলে। গঙ্গার জলে মড়া ভেসে যেত, তার উপর চেপে দিব্যি নৌসফর করত।

জংলি জায়গা ছিল বলুন! বীভৎস ভয়াবহ।

তারই মধ্যে ছিল লাটের বাড়ি, সেন্ট জনস চার্চ, পার্ক স্ট্রিটের গোরস্থান, থিয়েটার রোডের থিয়েটার, আর আরও কত সাহেব-সুবাদের বাড়ি। এ অঞ্চলটাকে বলত হায়াইট টাউন—

এদিকে নেটিভদের নৌ-পাত্তা, আর উত্তর কলকাতা ছিল ব্ল্যাক টাউন।

গায়ের রক্ত গরম হয়ে যাচ্ছে মশাই।

পার্ক স্ট্রিটে এসে মোড় ঘুরে ব্লু ফক্সের আগেই ফেলুদা গাড়ি থামাতে বলল।——একবার বইয়ের দোকানে ঢুঁ মারতে হবে।

অক্সফোর্ড বুক কোম্পানি সম্পর্কে লালমোহনবাবুর কোনও উৎসাহ নেই, কারণ এখানে রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজের বই বিক্রি হয় না। বললেন, আমাদের কলেজ স্ট্রিট আর বালিগঞ্জের ব্ল্যাকবুকশপ বেঁচে থাকুক।

ফেলুদা দোকানে ঢুকে এদিক-ওদিক ঘুরে একটা কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সামনে থরে থরে সাজানো রয়েছে নীল আর লাল খাতা, ফাইল, ডাইরি, এনগেজমেন্ট প্যান্ড। একটা নীল খাতা হাতে তুলে দামটা দেখে নিল। বারো-পঞ্চাশ। ঠিক এ-রকম খাতা ছিল নরেন বিশ্বাসের টেবিলে।

ইয়েস?

দোকানের একজন লোক এগিয়ে এসেছে ফেলুদার দিকে।

কুইন ভিক্টোরিয়ার কোনও চিঠির কালেকশন আছে আপনাদের এখানে?

কুইন ভিক্টোরিয়া? নো স্যার। তবে আপনি প্রকাশকের নাম বলতে পারলে আমরা আনিয়ে দিতে পারি। যদি ম্যাকমিলন বা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি হয় তা হলে ওদের কলকাতার আপিসে খোঁজ করে দেখতে পারি।

ফেলুদা কী যেন ভাবল। তারপর বলল, ঠিক আছে। আমি খোঁজ করে আপনাদের জানাব।

আমরা পার্ক স্ট্রিটে বেরিয়ে এলাম। গাড়িটা এগিয়ে ব্লু ফক্সের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, আমরা হেঁটে এগোতে লাগলাম।

একটু দাঁড়া!— ফেলুদা পকেট থেকে তার খাতাটা বার করেছে।–ভিড়ের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে পড়া যায় না।

কয়েক সেকেন্ড খাতায় চোখ বুলিয়েই ফেলুদা আবার হাঁটতে শুরু করল। কিছু পেলে? আমি জিজ্ঞেস করলাম। জবাব এল: আগে ব্লু ফক্সে গিয়ে বসি।

রেস্টোরান্টে বসে জানা গেল বু ফক্স নামটা ভাল লাগে বলেই লালমোহনবাবু আমাদের এখানে এনেছেন। নিজে এর আগে কখনও আসেননি। এমনকী পার্ক স্ট্রিটের কোনও রেস্টোরান্টেই আসেননি! –থাকি সেই গড়পারে। পাবলিশার কলেজ স্ট্রিট পাড়ায়, এ তল্লাটে খেতে আসার মওকই বা কোথায় আর দরকারই বা কী?

চা আর স্যান্ডউইচ অর্ডার দেবার পর ফেলুদা খাতাটা আবার বার করে টেবিলের উপর রাখল। তারপর সেই পাতাটা খুলে বলল, প্রথম লাইনটা এখনও রহস্যাবৃত। দ্বিতীয়টা কবজ। করে ফেলেছি। এগুলো সব বিদেশি প্রকাশকের নাম।

কোনগুলো? জিজ্ঞেস করলাম আমি।

MM, OU, GAAS, আর WN হল যথাক্রমে ম্যাকমিলন, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, জর্জ অ্যালেন অ্যান্ড আনউইন, সিজিক অ্যান্ড জ্যাকসন, ওয়াইডেনফেলড অ্যান্ড নিকলসন।

বাপরে বাপ, বললেন জটায়ু, আপনার জিহ্বার জয় হাক! এতগুলো ইংরিজি নাম হোঁচট না খেয়ে একধরসে আউড়ে গেলেন। কী করে মশাই?

বোঝাই যাচ্ছে ভদ্রলোক এইসব পাবলিশারদের চিঠি লিখতেন বা লিখছেন, ভিক্টোরিয়ার চিঠির সংকলন সম্বন্ধে খোঁজ করে। অথচ মজা এই যে, এত না করে ব্রিটিশ কাউনসিল বা ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে ভিক্টোরিয়ার চিঠি পড়ে আসা ঢের সহজ ছিল।

এ যেন মাথার পিছন দিক দিয়ে হাত ঘুরিয়ে নাক দেখানে, মন্তব্য করলেন জটায়ু।

ফেলুদা খাতাটা পকেটে পুরে স্যান্ডউইচের জায়গা করে দিয়ে একটা চারমিনার ধরাল। লালমোহনবাবু টেবিলের উপর তাল ঠুকে একটা বিলিতি ধাঁচের সুরের এক লাইন গুন গুন করে বললেন, চলুন কোথাও বেরিয়ে পড়ি শহরের বাইরে। বাইরে গেলেই দেখিচি আপনার কেসও জোটে, আমার গল্পও জোটে। কোথায় যাওয়া যায় বলুন তো? বেশ রুক্ষ জায়গা হওয়া চাই। সমতল শস্যশ্যামলা আয়েশি ভেতে মিনমিনে পরিবেশ হলে চলবে না। বেশ একটা—

স্যান্ডউইচের প্লেট এসে পড়ায় আর কথা এগোল না। আমাদের তিনজনেরই খিদে। পেয়েছিল বেশ জবর। একসঙ্গে দু জোড়া স্যান্ডউইচে একটা বিশাল কামড় দিয়ে তিনবার চোয়াল খেলিয়েই লালমোহনবাবু কেন জানি থমকে গেলেন। তারপর গোল গোল চোখ করে দুবার পর পর ঈশ্বরের জয়... ঈশ্বরের জয় বললেন, যার ফলে মুখ থেকে কয়েকটা রুটির টুকরো ছিটকে বেরিয়ে টেবিলের ওপর পড়ল।

ব্যাপারটা হল এই—আমি আর ফেলুদা রাস্তার দিকে মুখ করে বসে ছিলাম, আর লালমোহনবাবুর মুখ ছিল রেস্টোরান্টের পিছন দিকটায়। ঘরের শেষ মাথায় একটা নিচু প্ল্যাটফর্ম, দেখেই বোঝা যায়। সেখানে রাত্রে বাজনা বাজে। সেখানে একটা সাইনবোর্ড দেখেই জটায়ুর এই দশা। তাতে রয়েছে এই বাজনার দলের নাম, আর নামের ঠিক তলায় লেখা— গিটার-ক্রিস গডউইন।

ফেলুদা হাত থেকে স্যান্ডউইচ নামিয়ে একটা বেয়ারাকে তুড়ি দিয়ে কাছে ডাকল।

এখানে ডিনারের সময় বাজনা বাজে?

হাঁ বাবু, বাজতা হ্যায়।

তোমাদের ম্যানেজারের সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?

ক্রিস গডউইনের ঠিকানা জোগাড় করাই ফেলুদার উদ্দেশ্য, আর তার জন্য একটা জুতসই অজুহাতও রেডি করে রেখেছিল। ম্যানেজার আসতে বলল, বালিগঞ্জ পার্কের মিস্টার মানসুখানির বাড়িতে বিয়ের জন্য একটা ভাল বাজিয়ে গ্রুপ চাই। আপনাদের এখানের দলটার খুব নাম শুনেছি।-তারা কি বিয়েতে ভাড়া খাটবে?

হোয়াই নট? এটাই তো তাদের পেশা।

ওই যে গডউইন নামটা দেখছি, ওই বোধহয় লিডার? ওর ঠিকানাটা যদি...

ম্যানেজার একটা স্লিপে ঠিকানাটা লিখে ফেলুদাকে এনে দিলেন। দেখলাম লেখা আছে— ১৪/১ রিপন লেন।

অন্য দিন হলে গল্প-টল্প করে চা-স্যান্ডউইচ খেতে যতটা সময় লাগত, আজ অবিশ্যি তার চেয়ে অনেক কম লাগল। ফেলুদার খিদে মিটে গেছে; সে একটার বেশি খেল না। লালমোহনবাবু অসম্ভব স্পিড়ে আর এনার্জির সঙ্গে ফেলুদার দুটো আর নিজের তিনটে খেয়ে ফেলে বললেন,পয়সা যখন পুরো দেব তখন খাবার ফেলা যায় কেন মশাই?

ফোর্টিন বাই ওয়ান রিপন লেনের বাইরেটা দেখে মনটা দমে যাওয়া স্বাভাবিক।-কারণ সাদত আলির নবাবির কথা এখনও ভুলতে পারিনি। কিন্তু ফেলুদা বলল, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। চার-পাঁচ পুরুষের ব্যবধানে একটা পরিবার যে কোথা থেকে কোথায় নামতে পারে তার কোনও লিমিট নেই। অবিশ্যি বাড়িগুলো যে খুব ছোট তা নয়, সবই তিনতলা চারতলা, কিন্তু কোনওটারই বাইরেটা দেখে ভিতরে ঢুকতে ইচ্ছে করে না। লালমোহনবাবু বললেন যে, বোঝাই যাচ্ছে এর প্রত্যেকটাই হানাবাড়ি। যাই হাক, ঢোকার আগে পাশেই একটা পানবিড়িওয়ালাকে ফেলুদা জিজ্ঞেস করে নিল।

ইয়ে কোঠিমে গডউইন সাহাব বোলকে কোই রহিতা হ্যায়?

গুডিন সাহাব? জো বাজা বাজাত হ্যায়?

সে ছাড়া আরও আছে নাকি?

বুঢ়ঢ সাহাব ভি হ্যায়। মার্কিস সাহাব। মার্কিস গুডিন।

কোন তলায় থাকেন সাহেব?

দো তল্লা। তিন তল্লামে আর্কিস সাহাব।

আর্কিস-মার্কিস দুই ভাই নাকি বাবা? প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু।

নেহি বাবু। আর্কিস সাহাব আর্কিস সাহাব, মার্কিস সাহাব গুডিন সাহাব—দো তল্লামে মার্কিস সাহাব, তিন তল্লামে...

ফেলুদা আর্কিস-মার্কিসের ঝামেলা ছেড়ে ইতিমধ্যে চোদ্দ বাই একে ঢুকে পড়েছে। আমরাও দুগ্গা বলে তার পিছন পিছন ঢুকলাম।

যা ভেবেছিলাম। তাই। ভিতরে বাইরে কোনও তফাত নেই। জুন মাসের দিন বড় বলে এই সাড়ে ছাঁটার সময়ও বাইরে আলো রয়েছে, কিন্তু ভিতরে সিঁড়ির কাছটায় একেবারে মিশমিশে অন্ধকার। ফেলুদার একটা অদ্ভূত ক্ষমতা আছে—হয়তো ওর চোখটাই ওইভাবে তৈরি— অন্ধকারে সাধারণ লোকের চেয়ে ও অনেক বেশি দেখতে পায়। ওর তরতরিয়ে সিঁড়ি ওঠা দেখে লালমোহনবাবু রেলিংটাকে খামচে ধরে কোনওরকমে উঠতে উঠতে বললেন, ক্যাট-বার্গলার হয় জানতুম মশাই, ক্যাট-গোয়েন্দা এই প্রথম দেখলুম।

দোতলা থমথমে। একটা ক্ষীণ বাজনার শব্দ শোনা যাচ্ছে, বোধ হয় কোনও রেডিও থেকে আসছে। সিঁড়ির মুখে একটা দরজা, তার পিছনে বারান্দা, তাতে আলো না জ্বললেও বাইরেটা খোলা বলে খানিকটা দিনের আলো এসে পড়ে বারান্দার ভাঙা-কাচের টুকরো বসানো। মেঝেটাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। আমাদের বাঁয়ের দরজা দিয়ে যে ঘরটা দেখা যাচ্ছে তাতে কেউ নেই, কারণ বাতি জ্বলছে না। ভিতরে বারান্দার বাঁ দিকে একটা ঘর আছে বুঝতে পারছি, কারণ সেই ঘর থেকেই এক চিলতে আলো এসে বারান্দার একটা কোণে পড়েছে। একটা কালো বেড়াল সেই আলোয় কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে একদৃষ্টি আমাদের দেখছে। তিনতলা থেকে পুরুষের গলার শব্দ পাচ্ছি মাঝে মাঝে। একবার যেন একটা ঘংঘঙে কাশির শব্দও পেলাম।

বাড়ি চলুন, বললেন জটায়ু। এ হল রিপন লেনের গোরস্থান।

ফেলুদা বারান্দার দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

কেই হ্যায়?

কয়েক সেকেন্ড কোনও শব্দ নেই, তারপর উত্তর এল—কোন হ্যায়?

ফেলুদা ইতস্তত করছে, এমন সময় আবার কথা এল, এবার বেশ কড়া স্বরে।

অন্দর আইয়ে!—আই কান্ট কাম আউট।

ভেতরে যাবেন, না বাড়ি যাবেন?

ফেলুদা লালমোহনবাবুর প্রশ্ন অগ্রাহ্য করে চৌকাঠ পেরিয়ে এগিয়ে গেল। ও ঘুড়ি, আমরা ল্যাজ, একেবেঁকে এগোলাম দুজনে পিছন পিছন।

কাম ইন, হুকুম এল বাঁয়ে ঘরের ভিতর থেকে।

০৬. মাঝারি সাইজের বৈঠকখানা

তিনজনে ঢুকলাম ভিতরে। একটা মাঝারি সাইজের বৈঠকখানা। দরজার উলটো দিকে একটা সোফা, তার কাপড়ের ঢাকনির তিন জায়গায় ফুটা দিয়ে নারকোলের ছোবড়া বেরিয়ে আছে। সোফার সামনে একটা শ্বেতপাথরের টেবিল;-এখন শ্বেত বললে ভুল হবে, কিন্তু এককালে তাই ছিল। বাঁয়ে একটা কালো প্রাচীন বুক কেস, তাতে গোটা পনেরো প্রাচীন বই। বুক কেসের মাথায় একটা পিতলের ফুলদানিতে ধুলো জমা প্লাস্টিকের ফুল, সে ফুলের রং বোঝে কার সাধ্যি। দেয়ালে একটা বাঁধানো ছবি, সেটা ঘোড়াও হতে পারে, রেলগাড়িও হতে পারে, এত ধুলো জুমেছে তার কাচে। যে ফিলিপস রেডিওটা সোফার পাশের টেবিলের উপর রাখা রয়েছে সেন্টার মডেল নির্ঘাত ফেলুদার জন্মেরও আগের। আশ্চর্য এই যে সেটা এখনও চলে, কারণ সেটা থেকেই গানের শব্দ আসছিল। এখন একটা শিরা-বার-করা ফ্যাকাসে হাত নব ঘুরিয়ে গানটা বন্ধ করে দিল। যার হাত, তিনি সোফার এক কোণে একটা কুশন কোলে নিয়ে বাঁ পা-টা, একটা মোড়ার উপর তুলে দিয়ে বসে মিটমিট করে আমাদের দিকে চাইছেন। এর শরীরে যে সাহেবের রক্ত আছে সেটা চামড়ার রং থেকে বোঝা যায়, আর চুলের যেটুকু পাকা নয় তার রং কটা। চোখটা যে কীরকম সেটা বুঝতে পারছি না, কারণ ছাত থেকে ঝোলানো যে বাতিটা জুলছে সেটার পাওয়ার পচিশের বেশি নয়।

আমি গাউটে ভুগছি, তাই চলাফেরা করতে পারি না, ইংরিজিতে বললেন সাহেব। আই হ্যাভ টুঁ টেক দ্য হেল্প অফ মাই সারভেন্ট। সে শুয়োরটা আবার ফাঁক পেলেই সিটকায়।

ফেলুদা এবার পরিচয়ের ব্যাপারটা সেরে নিল। ভদ্রলোক আমরা আসতে বিরক্ত হলেও সেটা এখনও প্রকাশ করেননি। ফেলুদা কাজের কথায় চলে গেল।

আমি শুধু একটা খবর জানতে এসেছি। আপনি কি টমাস গডউইনের বংশধর-যিনি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন?

সাহেব মাথাটা আর একটু তুললেন। এবারে বুঝলাম তার চোখের রং ঘোলাটে নীল। কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে ফেলুদার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, নিউ হাও দ্য হেল ডিড ইউ নো অ্যাবাউট মাই গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার?

তা হলে আমার অনুমান ঠিক?

শুধু তাই নয়; আমার কাছে এমন একটা জিনিস আছে। যেটা খোদ টমাস গড়উইনের সম্পত্তি। অন্তত আমার ঠাকুমা তাই বলতেন। দেড়শো বছরের-ও হেল!

কী হল?

দ্যাট স্কাউন্তের্ভুল অ্যারাকিস–ঠক, জোচোর! কালই রাত্রে ওটা চেয়ে নিয়ে গেছে। বলেছে। আজ ফেরত দেবে। আজই ওদের মিটিং বসবে। আজ বিষ্যুদবার তো? একটু পরেই শুনতে পাবে মাথার উপরে সব উদ্ভট আওয়াজ।

মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে বলেই বোধ হয়। ঘরটা আরও অন্ধকার লাগছে; কিংবা হয়তো সত্যি করেই রাত হয়ে আসছে। না, মেঘ ডাকল। আকাশে মেঘ করেছে, তাই অন্ধকার।

ফেলুদা মিঃ গডউইনের সামনে একটা হাতলভাঙা চেয়ারে বসেছে। তার ডান পাশে আরামকেদারায় জটায়ু। আরাম খুব হচ্ছে না, কারণ উসখুসে ভাব দেখে মনে হয় ছারপোকার কামড় খাচ্ছেন। আমি বসেছি বাঁয়ে একটা চেয়ারে। ফেলুদা চেয়ে আছে একদৃষ্টে সাহেবের দিকে; ভাবটা-তুমি যা বলতে চাও বলো, আমি শুনতে এসেছি।

ইটস অ্যান আইভরি কাসকেট, বললেন মিঃ গডউইন।ভেতরেও জিনিস আছে। দুটো পুরনো পাইপ, একটা রুপোর নাস্যির কোটা, একটা চশমা, আর সিল্কে মোড়া একটা প্যাকেট।

ভেতরে বইটই আছে বলে মনে হয়; কোনওদিন খুলিনি। আরও সব ছিল বাড়িতে পুরনো জিনিস; আমার বাউণ্ডুলে ছেলেটা সব বেচে দিয়েছে। পড়াশুনোয় জলাঞ্জলি দিয়ে গাঁজা ধরল, আর তারপরেই ঘর থেকে এটা-ওটা সরিয়ে ফেলতে শুরু করল। বাক্সটা যে কেন নেয়নি জানি না। হয়তো নিত; কপাল ফিরে গেল তাই নেবার দরকার হয়নি। বাজনার দল করেছে একটা। তার রোজগারেই চলছে এখন—যদি চলা বলো এটাকে। ছেলেকে আর দোষ দিই। কী করে? আমারই কি কম দোষ? শুনেছি টম গডউইন জুয়ো খেলে সর্বস্ব খুইয়েছিলেন। আমারও তাই।...

ভদ্রলোক একটু থামলেন। হাঁপাচ্ছেন। বোধহয় একটানা এত কথা বলে। বাতের যন্ত্রণাতেই বাধ হয় একবার মুখটা বেঁকে গেল। তারপর আবার কথা।–

একবার বিলেত গিয়েছিলাম। ইয়ং বয়সে। ছোট কাকা ছিল লন্ডনে, মিডল্যান্ড ব্যাঙ্কে ক্যাশিয়ারি করত। তিন মাসের বেশি থাকতে পারিনি। শীত সহ্য হয়নি। খানা সহ্য হয়নি। ডালভাতের অভ্যোস। ফিরে এলাম ক্যালকাটা। বিয়ে করলাম। বউ মরেছে। দশ বছর আগে। এখন আছে ক্রিস্টোফার। মুখ দেখি দিনে একটিবার হয়তো; কি তাও না। পাশের ঘরে বসে গিটারে ট্যাং ট্যাং করে। হাত ভাল।

মাথার উপরে সত্যিই একটা অদ্ভুত আওয়াজ শুরু হয়েছে। খটখট—খটখট। হচ্ছে আবার থামছে, ঘরের ছায়াগুলো দুলছে, কারণ খাট খটের সঙ্গে সঙ্গে সিলিং-এর বাতিটা দুলতে আরম্ভ করেছে। এখন আর শুধু লালমোহনবাবু না; আমারও ভয় করছে। এরকম বাড়িতে, এরকম ঘরে কখনও আসিনি; এরকম মানুষের মুখে এরকম কথা কখনও শুনিনি। কী ব্যাপার হচ্ছে ওপরের ঘরে?

গডউইন সাহেব ওপরে না তাকিয়েই বললেন, টেবিলটা লাফাচ্ছে। চার ব্যাটা ভণ্ড টেবিলটাকে ঘিরে বসেছে। বলে মরা লোকের আত্মা নামায় ওরা, আর যেই সে আত্মা আসে অমনি টেবিলটা ছটফট করতে শুরু করে।

ওরা কারা? ফেলুদা প্রশ্ন করল।

অ্যারাকিসের দল। প্রেতচর্চা সমিতি। দুটো ইহুদি, একটা পার্শি, আর অ্যারাকিস। আমাকে দলে টানতে চেয়েছিল, আমি যাইনি। এক'দিন অ্যারাকিসের কাছে টমাস গডউইনের কথা বলেছিলাম। বললে, তোমাকে তার সঙ্গে কথা

বলিয়ে দেব। আমি বললাম—নো, সার্টেনলি নট। আজ বাদে কাল এমনিতেই তার সঙ্গে দেখা হবে। তারপর কাল এসে বললে—

ভদ্রলোক থামলেন। খট খট খট। আবার টেবিল লাফাচ্ছে।

কিন্তু বাক্সটা কেন নিল আপনার কাছ থেকে? প্রশ্ন করল ফেলুদা।

সেটাই তো বলছি। বললে, আমরা তোমাকে ছাড়াই গডউইনের আত্মা নামাব। তার নিজের জিনিস কিছু থাকলে দাও, সেটা টেবিলের উপর রাখলে আত্মা সহজে নামবে। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে তিনি নেমেছেন।

খট খট খট...আবার টেবিল লাফাল।

ব্যাপারটা কি অন্ধকারে হয়? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

সব বুজরুকিই তো অন্ধকারে হয়।—গডউইনের গলার স্বরে বিদ্রুপ।

একবার উপরে যাওয়া যায়?

লালমোহনবাবু প্রশ্নটা শুনেই চেয়ারের হাতল খামচে তাঁর আপত্তি জানিয়ে দিয়েছিলেন। গডউইন সাহেবের উত্তরে তিনি অনেকটা আশ্বস্ত হলেন।

ও ঘরে তামায় ঢুকতে দেবে না, বললেন মিঃ গডউইন। ফর মেমবারসওনলি। ওর চাকর পাহারা দেয়। তবে কেউ যদি কারুর আত্মা নামাতে চায় ওদের সাহায্যে, তো সে আলাদা কথা। আগাম বিশ টাকা, আত্মা নামলে আরও একশো।

আই সি...

ফেলুদা উঠে পড়ল।আচ্ছা, মিস্টার গডউইন। অনেক ধন্যবাদ। আপনাকে বিরক্ত করে গেলাম, কিছু মনে করবেন না।

গুড নাইট।

গডউইন সাহেবের শীর্ণ হাত আবার রেডিওর দিকে চলে গেল।

ল্যান্ডিং-এ এসে ফেলুদা যেটা করল সেটা আমাকে হকচাকিয়ে দিল, লালমোহনবাবুর যে কী দশা হল সেটা অন্ধকারে বুঝতে পারলাম না। ফেলুদা নীচে না গিয়ে সটান তিনতলায় রওনা দিল।

আপ-ডাউন গুলিয়ে ফেললেন নাকি? ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করলেন জটায়ু। উত্তর এল, চলে আসুন, ঘাবড়াবেন না।

উপরে উঠেই সামনে লুঙ্গি পরা দারোয়ান।

আপ কিসকো মাংতে হ্যায়?

আমি শুধু তোমার প্রয়োজন মেটাতে এসেছি ভাই!

ফেলুদা অ্যারাকিস সাহেবের দারোয়ানের দিকে একটা পাঁচ টাকার নোট এগিয়ে দিয়েছে। লোকটা থাতমত। ফেলুদা তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, তোমার মনিব যে-ঘরে বসেছেন। সেটা এখন চারদিক থেকে বন্ধ কি না সেটা আগে বলো।

ওষুধ ধরেছে বোধহয়। চাকর বলল কারান্দার দিক থেকে বন্ধ, কিন্তু শোবার ঘর দিয়ে দরজা আছে ঢোকার; সেটা খোলা।

তোমার কোনও চিন্তা নেই—কিছু করতে হবে না—শুধু একবারটি শোবার ঘরটা দেখিয়ে দাও। নইলে বিপদ হবে। আমরা পুলিশের লোক। ইনি দারোগা।

লালমোহনবাবু পায়ের বুড়ো আঙুলে দাঁড়িয়ে হাইটটা ঝাঁট করে দু ইঞ্চি বাড়িয়ে নিলেন। এ ল্যান্ডিং-এ বাতি আছে। ফেলুদা নোটটা আর একটু এগিয়ে একেবারে দারোয়ানের হাতের তেলোতে ঠেকিয়ে দিল। তেলোটা আপনা থেকেই নোটের উপর মুঠো হয়ে গেল।

আইয়ে—লেকিন...

লের্কিন-টেকিন ছাড়ো ভাই! তোমার মনিবের বন্ধুদের একজনের ওপর পুলিশের সন্দেহ, তাই যাওয়া দরকার। তোমার সাহেবের বা তোমার কিচ্ছু হবে না।

আইয়ে।

শোবার ঘর অন্ধকার, আর তার একটা খোলা দরজার ওদিকে যে ঘর, সেও অন্ধকার। আমরা তিনজনে সেই দরজাটার দিকে এগিয়ে গেলাম।

প্ল্যানচেটের ঘর থেকে এখন কোনও শব্দ নেই। তবে একটু আগে পর পর তিনবার টেবিলের পায়ের শব্দ পেয়েছি। বুঝতে পারছি ভূত নামানোর ক্লাবের সদস্যরা সব দম বন্ধ করে টমাস গডউইনের আত্মার জন্য অপেক্ষা করছেন। লালমোহনবাবু এত জোরে আর এত দ্রুত নিশ্বাস ফেলছেন যে ভয় হচ্ছে তাতেই পাশের ঘরের সবাই আমাদের অস্তিত্ব টের পেয়ে যাবে। ফেলুদা ইতিমধ্যে বোধহয় দরজার আরও কাছে এগিয়ে গেছে। কোথেকে যেন কেরোসিন তেলের গন্ধ আসছে। একবার শুনলাম একটা বেড়াল ম্যাও করল। বোধহয় দোতলার সেই কালো হুলোটা।

ট—মাস গডউইন! ট—মাস গডউইন।

গোঙানির মতো স্বরে নামটা দুবার উচ্চারিত হল। বুঝলাম। এইভাবেই এরা আত্মাকে ডাকে।

আর ইউ উইথ আস? আর ইউ উইথ আস?

কোনও সাড়া নেই, কোনও শব্দ নেই। প্রায় আধ মিনিট হয়ে গেল। তারপর আবার সেই কাতর প্রশ্ন–

টমাস গডউইন.আর ইউ উইথ আস?

ইয়ে-স! ইয়ে-স!

আমার ডান পাশেও পায় ঠক ঠক করে কাঁপছে। টেবিলের নয়, মানুষের। লালমোহনবাবুর হাঁটু।

ইয়েস। আই হ্যাভ কাম! আই অ্যাম হিয়ার!

হিয়ার বললেও মনে হয় বহু দূর থেকে আসছে গলার স্বরটা।

প্ল্যানচেটের দল আবার প্রশ্ন করল।

তুমি কি সুখে আছ? শান্তিতে আছ?

উত্তর এল-নো-ও!

কী দুঃখ তোমার?

প্রায় আধ মিনিট সব চুপ। তারপর আবার প্রশ্ন করল অ্যারাকিসের দল।

কী দুঃখ তোমার?

আই...আই...আই...ওয়ন্ট মাই...আই ওয়ন্ট মাই...কাসকেট।

এর পরেই একসঙ্গে কতকগুলো অদ্ভুত ব্যাপার। পাশের ঘর থেকে এক ভয়াবহ চিৎকার, আতঙ্কের শেষ অবস্থায় যেটা হয়—আর পরমুহূর্তেই আমার হাতে একটা হ্যাঁচকা টান আর কানের কাছে ফিসফিস—চলে আয়, তোপ্‌সে!

অ্যারাকিসের চাকর আমাদের তিনজনকে ছুটে বেরোতে দেখে যেন আরও হতভম্ব হয়ে কিছুই করল না। এক মিনিটের মধ্যে তিনজনে রিপন লেন পেরিয়ে রয়েড স্ট্রিটে রাখা আমাদের গাড়িটার দিকে এগোতে লাগলাম।এ এক খেল দেখালেন মশাই বললেন লালমোহনবাবু। এ জিনিস ফিল্মে দেখালে সুপারহিট।

লালমোহনবাবুর তারিফের কারণ আর কিছুই না; ফেলুদার হাতে এসে গেছে সাদত আলির দেওয়া টমাস গডউইনের আইভরি কাসকেট।

০৭. ফেলুদা নিজেই আমাকে তার ঘরে ডেকে পাঠিয়েছে

পরদিন সকাল। ফেলুদা নিজেই আমাকে তার ঘরে ডেকে পাঠিয়েছে। কাল রাত্রে লালমোহনবাবু আমাদের নামিয়ে দিয়ে যাবার পর আধা ঘণ্টার মধ্যে স্নান-খাওয়া সেরে ফেলুদা তার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। সত্যি বলতে কী, রাত্রে আমার ভাল করে ঘুমাই হয়নি। বেশ বুঝতে পারছি যে আমরা একটা আশ্চর্য রকম প্যাঁচালো রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়েছি! এ গোলকধাঁধার কাছে লখনী-এর ভুলভুলাইয়া হার মেনে যায়। কোন দিকে কোন রাস্তায় যেতে হবে জানি না, সব ভরসা ফেলুদার উপর। অথচ ফেলুদা নিজেই কি ভুলভুলাইয়া থেকে বেরোনোর পথ জানে?

ফেলুদা তার ঘরে খাটের উপর বসে, তার সামনে টমাস গডউইনের বাক্স, তার ভিতরের জিনিস খাটের উপর ছড়ানো। দুটো তামাক খাবার সাদা পাইপ-তেমন পাইপ আমি কখনও চোখেই দেখিনি; একটা রুপোরা নাস্যির কোটো; একটা সোনার চশমা, আর চারটি লাল চামড়ায় বাঁধানো খাতা–তার প্রত্যেকটার মলাটে সোনার জল দিয়ে লেখা ডায়রি। খাতাটা যে সিল্কের কাপড়ে বাঁধা ছিল সেটা বিছানার উপরেই পড়ে আছে, আর তার পাশে পড়ে আছে নীল ফিতেটা। ফেলুদা একটা খাতা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, খুব সাবধানে প্রথম পাতাটা উলটে দ্যাখ।

এ কী! এ যে শার্লট গাল্ডউইনের খাতা!

১৮৫৮ থেকে ৬২ পর্যন্ত। যেমন মুক্তোর মতো হাতের লেখা, তেমনি স্বচ্ছন্দ ভাষা। কাল সারা রাত ধরে পড়ে শেষ করেছি। কী অমূল্য জিনিস যে রিপন লেনের অন্ধকূপের মধ্যে এতকাল পড়েছিল, তা ভাবা যায় না।

আমি অবাক হয়ে প্রথম পাতাটার দিকে চেয়ে আছি। আর উলটোতে সাহস পাচ্ছি না, কারণ বুঝতে পারছি পাতাগুলো ঝুরঝুরে হয়ে আছে। ফেলুদা বলল, অ্যারাকিস এ খাতা খুলেছিল।

কী করে জানলে?

খাতার পাতা অসাবধানে উলটালেই পাতার উপরের ডান দিকের কোণ আঙুলের চাপে ভেঙে যায়। এই দ্যাখ-

ফেলুদা একটা পাতা অসাবধানে উলটে দেখিয়ে দিল।

আর শুধু তাই না, বলে চলল ফেলুদা, এই ফিতেটা দ্যাখ! কয়েক জায়গায় ক্ষয়ে গেছে— একশো বছরের উপর গেরোবাঁধা অবস্থায় থাকার জন্য। কিন্তু ওই ক্ষয়ে যাওয়া জায়গা ছাড়াও দ্যাখ। এই দুটো জায়গায় ফিতে কেমন পাকিয়ে গেছে। এটা হচ্ছে টাটকা নতুন গেরোর জন্য। যে খুলেছে সে তত হিসেব করে ঠিক একই জায়গায় গেরো বাঁধেনি; সেটা করলে ধরা মুশকিল হত।

তোমার আঙুলে কালো দাগ কেন?—এটা আমি ঘরে ঢুকেই লক্ষ করেছি।

এটা আরেকটা ক্লু, বলল ফেলুদা। এটা বোঝানোর সময় পরে আসবে। দাগটা লেগেছে ওই নাস্যির কৌটোটা থেকে।

কী জানলে ওই ডায়েরি পড়ে? আগ্রহে আমার প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

টম গডউইনের শেষ বয়সের কথা, বলল ফেলুদা। একটা পয়সা হাতে নেই, খিটখিটে মেজাজ। এক ছেলে মরে গেছে, অন্য ছেলে ডেভিড়ের উপর কোনও বিশ্বাস নেই, কোনও টান নেই। কাউকে ট্রাস্ট করে না, এমনকী নিজের মেয়ে শার্লটকেও না। কিন্তু শার্লট তবু তার পরিচর্যা করে, তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, ভগবানের কাছে তার মঙ্গল প্রার্থনা করে। জুয়ায় সর্বস্ব গেছে টমাস গডউইনের, শার্লট নিজে সেলাইয়ের কাজ করে আর কার্পেট বুনে কলকাতার মেমসাহেবদের কাছে বিক্রি করে সংসার চালাচ্ছে। গডউইন লখনী-এর নবাবের কাছে দামি জিনিস যা পেয়েছিল সব বিক্রি করে দিয়েছে, কেবল তিনটি জিনিস ছাড়া। এই কাসকেট, এই নস্যির কৌটো-যেটা সে আগেই শার্লটকে দিয়েছিল–আর তৃতীয় হল সাদতের কাছে পাওয়া তার প্রথম বকশিশ।

সেটাও শার্লটকে দিয়ে গেছিল?

না। সেটা সে কাউকে দেয়নি। মারা যাবার আগে সে মেয়েকে বলে গিয়েছিল, সেটা যেন তার কফিনের মধ্যে পুরে তাঁর মৃতদেহের সঙ্গে কবর দেওয়া হয়। শার্লট তার বাপের ইচ্ছা পূরণ করে। মনে শান্তি পেয়েছিল।

সেটা কী জিনিস?

শার্লটের ভাষায়—ফাদারস প্রেশাস পেরিগ্যাল রিপিটার।

সেটা আবার কী?

এখানে ফেলু মিত্তিরও ফেল মেরে গেছে রে তোপ্‌সে। ডিকশনারিতে বলছে রিপিটার বন্দুক বা পিস্তল হতে পারে, আবার ঘড়িও হতে পারে। পেরিগ্যাল হয়তো কোম্পানির নাম। সিধু, জ্যাঠাও শিওর নন। তুই ঘুম থেকে ওঠার আগে ওর বাড়িতে ঢু মেরে এসেছি। দেখি, বিকাশবাবু যদি আলোকপাত করতে পারেন।

পার্ক স্ট্রিটে একটা নিলামের দোকান আছে; নাম পার্ক অ্যকশন হাউস। সেখানে বিকাশ চক্রবর্তী বলে এক ভদ্রলোক কাজ করেন যাঁর সঙ্গে ফেলুদার খুব আলাপ। একটা কেসের ব্যাপারে ফেলুদাকে ওখানে যেতে হয়েছিল বার কয়েক, তখনই চেনা হয়।

এই সেদিনও দোকানটার পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখেছি অনেক পুরনো ঘড়ি সাজানো রয়েছে। আমার মন বলছে। ওটা বন্দুক-টন্দুক নয়, ঘড়ি।

লালমোহনবাবু আসার আগে অবধি ফেলুদা শার্লট গডউইনের ডায়রি থেকে অনেক ঘটনা বলল। শার্লটের এক ভাইঝি বা বোনঝিরও কথা নাকি আছে ডায়রিতে। শার্লট তাকে উল্লেখ করেছে মাই ডিয়ার ক্লেভার নীস বলে। সে

নাকি কোনও কারণে তার ঠাকুরদাদাকে অসন্তুষ্ট করেছিল, কিন্তু মারা যাবার আগে টিম গডউইন তাকে ক্ষমা করে তাঁর আশীবাদ দিয়ে যান। শার্লটের দুই ভাই ডেভিড আর জনের কথাও ডায়রিতে আছে। ডেভিডের সমাধি আমরা সাকুলার রোডের গোরস্থানে দেখেছি। জন বিলেতে গিয়ে আত্মহত্যা করেন; কেন সেটা শার্লট জানতে পারেননি।

লালমোহনবাবু এসে বললেন, কাল সকাল অবধি দোটানার মধ্যে ছিলুম,-পুলকের জন্য ভক্তিমূলক গল্প লিখি, না আপনার সঙ্গে ভিড়ে পড়ি। কালকের কাণ্ডকারখানার পর আর দ্বিধা নেই। থ্রিল ইজ বেটার দ্যান ভক্তি। সেই বাক্সে কিছু পেলেন?

একটা সোয়াশো বছরের পুরনো ডায়রি থেকে জানলাম যে, টমাস গডউইনের কবর খুঁড়লে তুয়তো একটা পেরিগ্যাল রিপিটার পাওয়া যেতে পারে।

কী পিটার?

চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক। পেট্রিল কত আছে?

দশ লিটার ভরসুম তো আজ সকালেই।

গুড। ঘোরাঘুরি আছে!

পার্ক অকশন হাউসে ঢুকেই ফেলুদার ভুরুটা কুঁচকে গেল।

আসুন, মিস্টার মিত্তির।!! কী সৌভাগ্য আমার। কোনও নতুন কেস-টেস নাকি?

বিকাশবাবু এগিয়ে এসেছেন। বেশ চকচকে নাদুসনুদুস চেহারা, গাল ভর্তি পান। কেন জানি দেখলেই মনে হয় নর্থ ক্যালকাটার লোক।

আপনার যে সৌভাগ্য সে তো দেখতেই পাচ্ছি, বলল ফেলুদা।এই সেদিন দেখলাম গোটা আষ্টেক ছোট বড় ঘড়ি সাজানো রয়েছে; এর মধ্যেই সব বিক্রি হয়ে গেল?

কেন? কী ঘড়ি চাই আপনার? ওয়াল ক্লক? অ্যালার্ম ক্লক?

ফেলুদা তখনও এদিক ওদিক দেখছে। বিকাশবাবুকে দেখে কেন জানি মনে হচ্ছিল যে উনি ওই খটমট নামওয়ালা ঘড়ির বিষয় কিছু জানবেন না। ফেলুদার প্রশ্ন শুনে বললেন, রিপিটার বোধহয় এক রকমের অ্যালার্মি ঘড়ি। তবে পেরিগ্যাল ঠিক বুঝলাম না। তা ঘড়ির বিষয়ে জানার জন্য তো খুব ভাল লোক রয়েছে। তার বাড়িতে শুনেছি আড়াইশো রকম ঘড়ি আছে। ঘড়িপাগলা লোক আর কী।

কার কথা বলছেন?।

মিস্টার চৌধুরী। মহাদেব চৌধুরী।

বাঙালি?

বাঙালি হলেও মনে হয় পশ্চিম-টশ্চিমে মানুষ। ভাঙা-ভাঙা বলেন বাংলা। বেশির ভাগ ইংরিজিই বলেন। এলেমদার লোক। আগে বম্বে ছিলেন, এখন কলকাতায় এয়েছেন। আর এসেই, যা পাচ্চেন—একটু ভাল হলেই—কিনে নিচ্ছেন। অবিশ্যি পুরনো হওয়া চাই। আপনি যে বলচেন এখানে ঘড়ি দেখচোন না, তার বেশির ভাগই আপনি দেখতে পাবেন ওর বাড়িতে গেলে। আর লোকটা জানেও। আপনি একবারটি গিয়ে কথা বলে দেখুন না। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল–দেখেননি?

কী বিজ্ঞাপন?

কারুর কাছে কোনও পুরনো ঘড়ি বিক্রি থাকলে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে।

লোকটিকে একটি পুরোদস্তুর ধনকুবের বলে মনে হচ্ছে!

বাব্বা-ক্লথ মিল, সিনেমা হাউস, চা, জুট, রেসের ঘোড়া, ইম্পোর্ট-এক্সপোর্ট-কী চাই আপনার?

ঠিকানা জানেন?

জানি বইকী। কলকাতায় আলিপুর পার্ক, আর তা ছাড়া পেনেটিতে গঙ্গার ধারে একটা বাড়ি কিনোচে। ওখানেই কাছাকাছির মধ্যে কাপড়ের মিল। এখন বোধকরি কলকাতায় আছে, তবে আপনারা সকালে না গিয়ে বিকেলে যাবেন, এখন আপিসে থাকবেন।.দাঁড়ান, ঠিকানাটা লিখে দিচ্ছি।

মহাদেব চৌধুরীর ঠিকানা নিয়ে আমরা পার্ক অকশন হাউস থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আপনারা এক কাজ করুন, ফেলুদা গাড়িতে উঠে বলল, আমাকে ন্যাশনাল লাইব্রেরির এসপ্ল্যানেড রিডিং রুমে নামিয়ে দিয়ে একবারটি পার্ক স্ট্রিট গোরস্থানে গিয়ে দেখে আসুন তো রিপোর্ট করার মতো কিছু আছে কি না।

রিহিপোর্ট?-লালমোহনবাবুর গলা আর স্টেডি নেই।

হ্যাঁ, রিপোর্ট। আর কিছু দেখবার দরকার নেই, শুধু গডউইনের সমাধিটি একবার দেখে আসবেন। এ দুদিন জল হয়নি, জায়গাটা শুকনোই পাবেন। ওখানে কাজ সেরে চলে আসবেন আমার কাছে, তারপর বাইরে কোথাও খেয়ে নেওয়া যাবে। এখন আর বাড়ি ফেরার কোনও মনে হয় না। অনেক কাজ; একবার রিপন লেনেও যেতে হবে।

ফেলুদা গডউইন সাহেবের বাক্সটা ভাল করে ব্রাউন কাগজে প্যাক করে সঙ্গেই এনেছে, আর সৰ সময় বগলদাবা করে রেখেছে।

অবিশ্যি দিনের বেলা আর ভয়ের কী আছে বলুন, বললেন লালমোহনবাবু, সন্ধের দিকটাতেই একটু ইয়ে-ইয়ে লাগে।

মন যদি কুসংস্কারের ডিপো না হয় তা হলে ভূতের ভয় কোনও সময়ই নেই।

এসপ্ল্যানেডের পথে একটা ট্রাফিক জ্যামে পড়ে অপেক্ষা করার ফাঁকে লালমোহনবাবু বললেন, আপনি যে ঘড়ির খোঁজ করছেন, সে কি ট্যাঁক-ঘড়ি?

সে তো জানি না এখনও।

ট্যাঁক-ঘড়ি যদি হয় তো আমার কাছে একটা আছে।

কার ঘড়ি?

যার ঘড়ি তার তিনটে জিনিস রয়েছে আমার কাছে-ঘড়ি, ছড়ি আর পাগড়ি। গ্র্যান্ডফাদারের জিনিস। লেট প্যারীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়। আচ্ছা, প্যারী নামটা কেত্থেকে এল মশাই?

এখানেই ছিল, বলল ফেলুদা! আপনি বাংলা রাইটার হয়ে প্যারী মানে জানেন না? প্যারী হল রাধার আর এক নাম। যেমন রাধিকাচরণ, তেমনি প্যারীচরণ।

থ্যাঙ্ক ইউ সার। যা হোক, যা বলছিলাম-ঘড়িটা ভাবছি আপনাকে দিয়ে দেব।

ফেলুদা বেশ অবাক।

হঠাৎ?

একটা কিছু দেব দেব করছিলাম ক'দিন থেকে, আমার হিন্দি ছবির সাফল্যের পিছনে তো

আপনার অবদান কম নয়!-আর তার মানে এই গাড়িটা হওয়ার পিছনেও। হয়তো দেখবেন এ ঘড়িও সেই পেরিপিটার না কী বলছিলেন, সে জিনিস।

সেটার চান্স কম। তবে আপনি যে জিনিসটা অফার করলেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার কাছে খুব যত্নে থাকবে এটা কথা দিতে পারি। উনবিংশ শতাব্দীর জিনিস তো আর ব্যবহার করা যায় না—তবে দম দেব রোজ। ঘড়িটা চলে?

দিব্যি।

ফেলুদাকে নামিয়ে দিয়ে যখন আমরা গোরস্থানে পৌঁছলাম তখন প্রায় বারোটা বাজে। এখানে কাজ সেরে ফেলুদাকে তুলে নিয়ে আমরা যাব নিজামে মাটন রোল খেতে। এটা ফেলুদারই প্ল্যান, ও-ই খাওয়াবে। অবিশ্যি তার আগে যাওয়া হবে রিপন লেনে বাক্স ফেরত দিতে।

পার্ক স্ট্রিটে এ সময়টা ট্র্যাফিক কম, তাই দুপুর হওয়া সত্ত্বেও গোরস্থানের পরিবেশটা বেশ নিরিবিলি। গেট দিয়ে ঢুকে দু-একবার ডাকাডাকি করেও বরমদেও দারোয়ানের দেখা পেলাম না। সে আবার ইঁদুরের সৎকার করতে কোনও ঝোপের পিছনে গেছে কি না কে জানে।

আমরা মাঝখানের পথটা দিয়ে এগিয়ে গেলাম। লালমোহনবাবুকে যতই ঠাট্টা করি না কেন, আর ফেলুদা কুসংস্কারের কথা যাই বলুক না কেন, এই গোরস্থানটার ভিতরে ঢুকলে সাহসের খানিকটা কম পড়ে যায় ঠিকই। শুধু সমাধিগুলো থাকলেও না হয় হত, তার উপরে এত গাছপালা, এত ঝোপঝাড় আগাছা কচুবনে ছেয়ে আছে জায়গাটা যে, তাতে ছমছমে ভাবটা আরও বেড়ে যায়। অবিশ্যি লালমোহনবাবু যতটা বাড়াবাড়ি করছেন, ততটা করার মতো ভয়ের কারণ দিনের বেলা কী থাকতে পারে জানি না। ভদ্রলোক এগোতে এগোতে আড়চোখে ফলকগুলোর দিকে দেখছেন আর সমানে মন্ত্র আওড়ানোর মতো করে বিড়বিড় করছেন। কী যে বলছেন সেটা কান পেতে শুনে তবে বুঝতে পারলাম। সেটা শোনার মতোই বটে।

দোহাই পামার সাহেব, দোহাই হ্যাঁমিলটন সাহেব, দোহাই স্মিথ মেমসাহেব—ঘাড়টি মটকিও না বাবা, কাজে ব্যাগড়া দিয়ে না! তোমরা অনেক দিয়েচ, অনেক নিয়েচ, অনেক শিখিয়েচ, অনেক ঠেঙিয়েচ.ক্যাম্বেল সাহেব, অ্যাডাম সাহেব, আর—ই হু—তোমার নামের তো বাবা উচ্চারণ জানি না!—দোহাই বাবা, তোমরা ধুলো, ধুলো হয়েই থাকো বাবা, ধুলো...ধুলো...

আমি আর থাকতে পারলাম না। বললাম, কী ধুলো-ধুলো করছেন?

ছেলেবেলায় পড়িচি যে বাবা তপেশ—ডাস্ট দাউ আর্ট, টুঁ ডাস্ট রিটার্নেস্ট। এ সবই তো ধুলো।

তা হলে আর ভয় কীসের?

কবিরা যা লেখে সব কি আর সত্যি?

আমরা বাঁয়ের মোড় ঘুরেছি। গাছ এখনও পড়ে আছে। মাটি শুকনো। অনেক মাটি। টমাস গডউইনের সমাধি ঘিরে মাটির ঢিবি।

ধুলো...ধুলো...ধুলো...

লালমোহনবাবু যেন মনে সাহস আনার জন্যই যান্ত্রিক মানুষের মতো কথাটা বলতে বলতে গডউইনের সমাধির দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর তাকে তিনবার ক আর দুবার কিং কথাটা বলতে শুনলাম, আর তারপরই তিনি দাঁত কপাটি লেগে কাটা গাছের মতো সটান পড়ে গেলেন মাটির ঢিবির ওপর।

তার পা যেখানে পড়েছে তার পর থেকেই শুরু হয়েছে একটা গর্ত, সেটা প্রায় এক-মানুষ গভীর, আর সেই গর্তের মাটির ভিতর থেকে উঁকি মারছে একটা মড়ার খুলি।

০৮. লালমোহনবাবুর জ্ঞান ফিরে না এলে

বার দশেক ঝাঁকুনিতে লালমোহনবাবুর জ্ঞান ফিরে না এলে সত্যিই মুশকিল হত। কারণ এরকম অবস্থায় এর আগে আমি কখনও পড়িনি। ভদ্রলোক গায়ের ধুলোমাটি ঝেড়ে বললেন সাহিত্যিকদের নাকি সহজে অজ্ঞান হবার একটা টেনডেনসি আছে, বিশেষত ভয় পেলে, কারণ তাদের কল্পনাশক্তি সাধারণ লোকের চেয়ে অনেক বেশি ধারালো। তোমার দাদা যে কুসংস্কারের কথাটা বললেন সেটা একদম বাজে। আমার মধ্যে ও সব ইয়ে একদম নেই।

আমরা অবিশ্যি আর এক মিনিটও সময় নষ্ট না করে সোজা চলে গিয়েছিলাম ফেলুদার কাছে। ওর কাজও শেষ হয়ে গিয়েছিল; না হলেও ও যে এমন খবর শুনে সব কাজ ফেলে গোরস্থানে চলে আসবে সেটা জানতাম। গডউইনের সমাধি দেখে, মাটির ভিতর থেকে উঁকি মারা প্রায় দেড়শো বছরের পুরনো মড়ার খুলি দেখে আর চারিদিকটা ভাল করে সার্চ করে সমাধি থেকে হাত দশেক দূরে পড়ে থাকা একটা কোদাল ছাড়া আর কিছু পেল না ফেলুদা।

এবারে অবিশ্যি দারোয়ানের সঙ্গে দেখা হল। সে বলল তার ভাতিজার পানের দোকান আছে কাছেই লোয়ার সাকুলার রোডের মোড়ে, সেখানে একটা জরুরি কথা বলতে গিয়েছিল। সে কবর খোঁড়ার ঘটনা কিছুই জানে না। তার বিশ্বাস ঘটনাটা আগের রাত্রে ঘটেছে, আর যারা করেছে তারা পাঁচিল টপকে এসেছে। ফেলুদা দারোয়ানের সাহায্যে মিনিট পনেরোর মধ্যে মাটি আর গাছের পাতা দিয়ে গর্তটা মোটামুটি বুজিয়ে দিল। যাবার সময় দারোয়ানকে বলে গেল ঘটনাটা সে যেন কাউকে না বলে।

গোরস্থান থেকে আমরা সোজা চলে গেলাম রিপন লেনে।

চোদ্দো বাই একের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে আমাদের একটু বাধা পড়ল। একজন নামছেন সিঁড়ি দিয়ে, তার হাতে একটা লম্বা চামড়ার কেস। গিটারের কেস। বছর পাঁচশেক বয়সের একজন যুবক। এ ধরনের চেহারা যে-কোনও সময়ে, বিশেষ করে সন্ধের দিকে, পার্ক স্ট্রিটে গেলেই দেখা যায়, কাজেই বর্ণনা দেবার দরকার নেই। ক্রিস গডউইন এই যে বেরোল, ফিরবে বোধহয় সেই রাত্রে, ব্লু ফক্সের বাজনা সেরে।

দোতলা আজ আর কালকের মতো নিস্তব্ধ নয়; বৈঠকখানায় গলাবাজি চলেছে। একটা গলা আমাদের চেনা; অন্যটা মনে হয় তিন তলার সাহেবের। প্রথম গলা বিশ্রী ভাষায় ধর্মকাচ্ছে, আর দ্বিতীয় গলা ইনিয়ে-বিনিয়ে দোষ অস্বীকার করছে।কাসকেট কথাটা বার বার ব্যবহার করছেন। দুজনেই।

ফেলুদা বারান্দায় গিয়ে বৈঠকখানায় দরজায় টোকা মারল। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণের মতো শোনা গেল–কোন হ্যায়। আমরা তিনজনেই চৌকাঠ পেরোলাম। অচেনা ভদ্রলোকটির গায়ের রং হলদে, সর্বাঙ্গে মেচেতা, মাথায় টাক, দুটো দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো, বয়স ষাট-পয়ষট্টি। ভদ্রলোক আমাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন, ফেলুদা তাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে হাতের বাক্সটা মোড়ক খুলে সোফায় বসা মিঃ গডউইনের দিকে এগিয়ে দিল।

এটা কাল নিয়ে যাবার লোভ সামলাতে পারিনি। আমার রিসার্চে প্রচুর সাহায্য করবে।

গডউইন বাক্সটা পেয়ে এক মুহূর্ত হতভম্ব থেকে তারপর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

সো ইউ ফুলড দেম, ইউ ফুলড দেম! দোজ ফুলস!—ধূর্ত, ঠগ, জোচ্চোর।—এবার শুধু রাগ আর বিদ্রুপ, আর তার সবটা গিয়ে পড়েছে। অন্য ভদ্রলোকটির উপর।-টম গডউইনের প্রেতাত্মা নিয়ে গেছে তার বাক্স? ইনি কি টম গডউইনের প্রেতাত্মা?—দিস জেনটিলম্যান? কী মনে হয় তোমার?—এই যে, ইনিই হচ্ছেন মিস্টার অ্যারাকিস, আমার তিনতলার প্রতিবেশী, যার টেবিলের ছটফটানি আমার প্রত্যেক বিষ্যুদবারের সন্ধেগুলোকে মাটি করে দেয়!

মিস্টার অ্যারাকিস বাকার মতো বাক্সটার দিকে চেয়ে ছিলেন; এবারে তাঁর দৃষ্টি গেল ফেলুদার দিকে। তারপর আবার বোকার মতো দৃষ্টি ঘুরিয়ে দরজার দিকে এগোতে গিয়েই তাঁকে থেমে যেতে হল। ফেলুদা তার নাম ধরে ডেকেছে।

মিস্টার অ্যারাকিস!

ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে চাইলেন। ফেলুদা ধীরকণ্ঠে বলল, এই বাক্সর একটা জিনিস বোধহয় আপনার কাছে রয়ে গেছে।

সার্টেনলি নট! অ্যারাকিস গর্জিয়ে উঠলেন। আর সেটা আপনিই বা বুঝছেন কী করে? মাকাস, তুমি বাক্স খুলে দেখে নাও তো কোনও জিনিস কম পড়ছে কি না।

এতক্ষণে জানলাম মিঃ গডউইনের প্রথম নাম, আর সেই সঙ্গে আর্কিস-মার্কিস রহস্যের সমাধান হল।

মার্ক্সা গডউইন বাক্স খুলে তার ভিতর হাতড়ে দেখে একটু কিন্তু-কিন্তু ভাব করে বললেন, কই মিঃ মিটার, এতে তো সব জিনিসই আছে বলে মনে হচ্ছে।

ওই নাস্যির কোটোটা একবার বার করবেন কি?—যেটার বর্ণনা শার্লট গডউইন তার ডায়রিতে দিয়েছেন এবং বলেছেন ওর গায়ে পান্না চুনি এবং নীলা বসানো ছিল?

মিঃ গডউইন কৌটো বার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন।

ফেলুদা বলল, বুঝতে পারছেন কি যে, ওটা একটা সস্তা নতুন কৌটো, যাতে কালো রং মাখিয়ে পুরনো করার চেষ্টা করেছিলেন মিঃ অ্যারাকিস?

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওপর থেকে আসল নাস্যির কীটো এনে দিলেন মিস্টার অ্যারাকিস, আর মিঃ গডউইন তাকে দিয়ে ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে বলিয়ে নিলেন যে, সামনের বিষ্যুদবার যদি আবার খটখটানি শোনেন তা হলেই পুলিশে খবর দেবেন। কালো মুখ করে চোর অ্যারাকিস চোরের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

থ্যাঙ্ক ইউ, মিস্টার মিটার, হাঁপ ছেড়ে বললেন মার্কাস গডউইন।

শার্লট গডউইনের ডায়রি যে কত মূল্যবান জিনিস সেটা আপনি জানেন? প্রশ্ন ফেলুদার।

না। শার্লট গডউইনের ডায়রি ওই বাক্সে রয়েছে তা আমি জানতাম না, বললেন মার্কাস গডউইন। তবে একটা কথা আমি আপনাকে বলছি মিঃ মিটার—আমার পূর্বপুরুষদের নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র কৌতুহল নেই। সত্যি বলতে কী আমার কোনও বিষয়েই কোনও কৌতুহল নেই। এখন শুধু মরার দিনটির জন্য অপেক্ষা। ওই বেড়াল ছাড়া আর আমার আপনি বলতে কেউ নেই। সন্ধেবেলা একজনের বাড়িতে গিয়ে পোকার খেলতাম, এখন গাউটের জন্য তাও পারি না।

তা হলে প্রশ্নগুলো করে বোধহয় লাভ নেই।

কী প্রশ্ন?

আপনার ঠাকুরদাদার বাবার নাম ছিল ডেভিড, যার সমাধি রয়েছে। সার্কুলার রোড গোরস্থানে।

ইয়েস।

ডেভিডের আর কোনও ভাই বা বোন ছিল কি?

মনে নেই। আমার এক পূর্বপুরুষ আত্মহত্যা করেছিলেন। সে ডেভিডের ভাই কি না মনে নেই।

ডেভিডের ছেলে, অর্থাৎ আপনার ঠাকুরদাদার নাম ছিল অ্যাণ্ড্রু?

ইয়েস। হি ওয়াজ ইন দি আর্মি।

শার্লট গডউইন তার এক ভাইঝি বা বোনঝির কথা লিখেছেন। হিসেব করে দেখা যাচ্ছে, তিনি আপনার ঠাকুরদার আপনি বোন কিংবা–

আমার ঠাকুরদাদার কোনও ভাই-বোন ছিল না।

তা হলে কাজিন।

তাদের সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে পারব না, মিঃ মিটার। আমার স্মরণশক্তি অনেক’দিন থেকেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। তা ছাড়া আমাদের পরিবার তোমাদের মতো কাছাকাছি থাকে না। তারা সব ছিটকে ছড়িয়ে পড়ে। এ তো আর তোমাদের বাঙালিদের একান্নবর্তী পরিবার নয়।

***

সোসাইটি সিনেমার সামনে নিজামেতে বসে মাটন-রোল খেতে খেতে ফেলুদা লালমোহনবাবুকে একটা প্রশ্ন করল।

নিরেন বিশ্বাস লোকটাকে আপনার কেমন মনে হয়?

লালমোহনবাবু চিবোনো শেষ করে ঢোক গিলে বললেন, ভালই তো। চোখের মধ্যে বেশ একটা ইয়ে ভাব আছে।

আমারও তাই মনে হয়েছিল।

এখন আর হচ্ছে না?

অবিশ্যি একটা দোষেই একটা মানুষের গোটা চরিত্র নষ্ট করে দেয় না। কিন্তু এটা বলতেই হয় যে, ভদ্রলোক একটা মারাত্মক অন্যায় করে ফেলেছেন।

আমরা দুজনেই খাওয়া থামালাম।

আজ প্রমাণ পেলাম যে, ওর মানিব্যাগের কাটিং দুটো ন্যাশনাল লাইব্রেরির রিডিং রুমে সযত্নে রক্ষিত দেড়শো দুশো বছরের পুরনো খবরের কাগজ থেকে ব্লেড দিয়ে কেটে নেওয়া। আমার মতে, এ অপরাধের জন্য মানুষের জেল হওয়া উচিত।

আমি কল্পনা করতে চেষ্টা করলাম নরেনবাবু রিডিং রুমে বসে দম বন্ধ করে গোপনে কর্মচারীদের দৃষ্টি এড়িয়ে এই দুষ্কর্মটি করছেন, কিন্তু পারলাম না। সত্যি, মানুষকে দেখে চেনার উপায় নেই।

এটা একটা রোগ বলতে পারেন, ফেলুদা বলে চলল, আর এ ধরনের অন্যায় কাজ ধরা নাপড়ে সাক্সেসফুলি করতে পারলে মানুষ একটা উৎকট আনন্দও পায়, নিজেকে আর পাঁচ জনের চেয়ে বেশি চতুর মনে করে একটা আত্মতৃপ্তি অনুভব করে। ভেরি স্যাড।

মািটন রোলের পর লস্যির অর্ডারের সঙ্গে সঙ্গে ফেলুদা বিলটাও আনতে বলে দিল। ঘড়িতে বলছে আড়াইটা। আরও তিন ঘণ্টা সময় কাটিয়ে তারপর যেতে হবে। ঘড়ি-পাগল মিস্টার চৌধুরীর বাড়িতে। আমি জানি পেরিগ্যাল রিপিটারের সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ফেলুদার সোয়াস্তি নেই।

আচ্ছা মশাই, হাড়গিলেও কি এইভাবে খাবারের প্রত্যাশায় জানালার উপর বসে হাঁক পাড়ত নাকি?

আমাদের পাশেই রাস্তার দিকে একটা জানালা, তার উপর একটা কাক বসে বেশ কিছুক্ষণ থেকে কা-কা করছে। সেইটের দিকে তাকিয়েই লালমোহনবাবু প্রশ্নটি করেছেন।

সম্ভবত না, বলল ফেলুদা, তবে বাড়ির আলসে বা ছাতের পাঁচিলে যে বসত তার অনেক প্রমাণ পুরনো ছবিতে আছে।

আশ্চর্য, পাখিটার চেহারা যে কী রকম তাই জানি না।

জানার একটা উপায় হচ্ছে চিড়িয়াখানায় যাওয়া। আর না হয় চলুন কর্পোরেশন স্ট্রিট দিয়ে বেরোব। মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং-এর সামনেই কপোরেশনের সিম্বলে হাড়গিলের চেহারা দেখিয়ে দেব।

আপনি এখনও কর্পোরেশন স্ট্রিট বলছেন? হেসে বললেন জটায়ু।

থুড়ি, সুরেন ব্যানার্জি—

ফেলুদা থেমে গেল। চোখের চাহনি চেঞ্জ। পকেট থেকে খাতা বার করে কী জানি দেখল। তারপরেই ছটফট ভাব, কারণ বিল দিতে দেরি করছে। ফেলুদা বেয়ারা বলে হোক দিল—যেটা সচরাচর করে না। বিল দিয়ে গাড়িতে উঠে ড্রাইভার হরিপদকে নির্দেশ দিয়ে দিল। গাড়ি সুরেন ব্যানার্জি রোডে গিয়ে পড়ল। ফেলুদা বাড়ির নম্বর দেখছে, যদিও সব বাড়িতে নম্বর নেই— কলকাতার এই আরেকটা কেলেঙ্কারি। আরেকটু এগিয়ে যাব ভাই।...তোপ্‌সে, ১৪১ দেখলেই বলবি।

মনে পড়ে গেল—১৪১ SNB। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। বুকটা টিপ টিপ করছে।

ওই যে একশো একচল্লিশ!

গাড়ি থামল। বাড়ির গায়ে লেখা Bourne & Shepherd-BS! পাওয়া গেছে। মিলে গেছে।

ফেলুদার সঙ্গে আমরা দুজনও ভিতরে ঢুকলাম। লিফট দিয়ে উঠতে হবে।

দোতলায় লিফট থেকে বেরিয়েই একটা সোফা-বেঞ্চি পাতা ঘর। একজন কর্মচারী আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। ফেলুদার ইতস্তত ভাব, কারণ যে প্রশ্নটা করতে হল সেটায় একটা বেকুবি গন্ধ থাকতে বাধ্য।

ইয়ে—ভিক্টোরিয়ার কোনও ছবি আছে। আপনাদের এখানে?

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়া?

না। কুইন ভিক্টোরিয়া।

আজ্ঞে না। আমাদের এখানে শুধু যারা ভারতবর্ষে এসেছেন তাদের ছবি পাবেন। এডওয়ার্ড দ্য সেভেনথ পাবেন—যখন প্রিন্স অফ ওয়েলস ছিলেন—জর্জ দ্য ফিফথ, দিল্লির দরবার...

এসব এখনও পাওয়া যায়?

প্রিন্ট তৈরি থাকে না। নেগেটিভ আছে; অর্ডার দিলে করে দিই। ১৮৫৪ থেকে সব নেগেটিভ রাখা আছে।

বলেন কী! আঠারোশো চুয়ান্ন?

বোর্ন অ্যান্ড শেপার্ড হল পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রাচীনতম ফোটার দোকান।

তার মানে তো হাজার হাজার নেগেটিভ থাকবে আপনাদের এখানে!

আসুন না, দেখিয়ে দিচ্ছি। ওই যে দেখুন দেয়ালে ঝুলছে—১৮৮০-তে মনুমেন্টের উপর থেকে তোলা ছবি।

এতক্ষণ দেখিনি, এবার বলতে চোখ গেল। এক হাত বাই পাঁচ হাত সাইজের ছবি। মনুমেন্টের উপর থেকে প্রায় একশো বছর আগের কলকাতা শহর। ড্যালহাঁসি-এসপ্ল্যানেড থেকে শুরু করে উত্তরে যতদূর দেখা যায়। গির্জাগুলির মাথা অন্য সব বাড়িকে ছাপিয়ে উঠেছে। ত্রিসীমানায় একটাও হাইরাইজ নেই। দেখলেই বোঝা যায় শান্ত শহর।

নেগেটিভের ঘর দেখে চোখ টেরিয়ে গেল। ঘরের চার দেয়ালের মেঝে থেকে সিলিং অবধি শেলফ উঠে গেছে, আর প্রত্যেকটি শেলফ ব্রাউন রঙের চ্যাপটা চ্যাপটা বাক্সে ঠাসা। প্রত্যেক বাক্সের গায়ে লেখা রয়েছে তাতে কোন সালের কী ধরনের ছবি রয়েছে।

ফেলুদা শেলফগুলোর সামনে ঘুরে ঘুরে লেখাগুলোর দিকে কিছুক্ষণ খুব মন দিয়ে দেখে হাতের রিস্টওয়াচটার দিকে একবার চেয়ে আমাদের দিকে ফিরে বলল, তোরা ঘণ্টাখানেক ঘুরে আয়; আমার একটু কাজ আছে এখানে।

লিফটে উঠে লালমোহনবাবু বললেন, তোমার দাদার হুকুম শিরোধার্য। ওই একটা লোককে না বলা যায় না। কী পার্সোনালিটি! চলো একটিবার ফ্র্যাঙ্ক রস-এ।

গাড়িটা সুরেন ব্যানার্জি রোডেই রেখে আমরা চৌরঙ্গি দিয়ে গ্র্যান্ড হাটেলের দিকে হাঁটতে লাগলাম। লালমোহনবাবু কী ওষুধ কিনবেন জানি না, জানার দরকারও নেই; উদ্দেশ্য কেবল সময় কাটানো।

ভিড়ের মধ্যে কলিশন বাঁচিয়ে কিছুদূর এগোনোর পর ভদ্রলোক বললেন, কিছু বুঝতে পারছি ভাই তপেশা-তোমায় দাদার মতিগতি?

বলতে বাধ্য হলাম যে কিছুই বুঝছি না, তবে এটুকু আন্দাজ করতে পারছি যে, ফেলুদা

গডউইনের কবর খোঁড়ার একটা সম্পর্ক রয়েছে।,

দুশো বছর মাটির নীচে থাকার পরও যে দেহ কঙ্কাল অবস্থায় থাকে সেটা তুমি জানতে? জটায়ু জিজ্ঞেস করলেন।

এ ব্যাপারে জোব চার্নকের মৃতদেহ নিয়ে একটা ঘটনা ফেলুদা আমাকে বলেছিল: সেটা লালমোহনবাবুকে বললাম। চার্নক মারা যাবার দুশো বছর পরে সেন্ট জনস গির্জার একজন পাদ্রির মনে হঠাৎ সন্দেহ ঢোকে চার্নকের সমাধিস্থা

সত্যিই সমাধি তো, নাকি এমনিই একটা স্তম্ভ খাড়া করা হয়েছে। সন্দেহটা এমনিই পেয়ে বসে যে, পাদ্রি শেষে লোক দিয়ে মাটি খোঁড়ালেন। চার ফুট নীচে পর্যন্ত কিছু পাওয়া গেল না, কিন্তু আর দু ফুট খুঁড়তেই একটা কঙ্কালের হাত বেড়িয়ে পড়ল। পাদ্রি মানে মানে গর্ত বুজিয়ে দিলেন!

ফ্র্যাঙ্ক রসে গিয়ে লালমোহনবাবু যখন কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, ওয়ান ফারহ্যাঁনস ফর দি গামস ফ্যামিলি সাইজ, ঠিক তখনই লক্ষ করলাম দোকানে একজন চেনা লোক ঢুকছেন। তিনি অবশ্যি আমাদের দেখামাত্র চেনেননি; বার দু-তিন আমাদের দিকে তাকিয়ে তারপর মুখে হাসিটা এল। নরেনবাবুর ভাই গিরীনবাবু। হাতে একটা বড় বাক্স, তাতে লেখা হংকং ড্রাই ক্লিনারস। বললেন, দাদার জন্য ওষুধ নিতে এসেছি।

কেমন আছেন নরেনবাবু? জিজ্ঞেস করলেন জটায়ু।

দাদা বেটার। ভাল কথা-আপনাদের সঙ্গে সেদিন যিনি ছিলেন। তিনিই নাকি গোয়েন্দা প্রদোষ মিত্তির? দাদা দিলেন খবরটা। ভদ্রলোকের নাম শুনেছি আগে। ভাবছিলাম–

গিরীনবাবু ভুরু কুঁচকে একটু যেন অন্যমনস্ক হলেন। তারপর বললেন, ওঁকে বাড়িতে পাওয়া যায় কখন?

সেটা ঠিক বলা মুশকিল, আমি বললাম, তবে ডিরেক্টরিতে নম্বর পাবেন! আপনি আসতে চাইলে আগে ফোন করে নিতে পারেন।

হাঁ... ওঁর সঙ্গে একটু.ঠিক আছে, আমি টেলিফোন করে নেব। বলবেন প্রদোষিবাবুকে, দরকার পড়লে যাব-হেঃ হেঃ...

আমরাও হেঁ হেঁ করতে করতে ভদ্রলোকের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

নিউ মার্কেটে একটা চক্কর মেরে মতিশীল স্ট্রিট দিয়ে সুরেন ব্যানার্জিতে পড়লাম। বোর্ন অ্যান্ড শেপার্ডের সামনে এসে দেখি ফেলুদা গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ওর কাজ নাকি যা আন্দাজ করা গিয়েছিল তার একটু আগেই শেষ হয়ে গেছে। গিরীনবাবুর সঙ্গে দেখা হবার খবরটা ফেলুদাকে দিলাম।বটে? বলল ফেলুদা,কী বললেন ভদ্রলোক? আমি জানি ফেলুদাকে ভাসাভাসাভাবে কিছু বললে চলবে না, তাই যা কথা হল সব ডিটেলে বললাম। এমনকী ভদ্রলোকের হাতে লন্ড্রির বাক্সটার কথাও বললাম! ফেলুদা চুপ করে শুনে গেল! কাজ কেমন হল? লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

ফিস্ট ক্লাস, বলল ফেলুদা,একেবারে রত্নখনি। আর ওখান থেকে ফোন করে জেনে নিয়েছি মিঃ চৌধুরী বাড়ি ফিরেছেন। পাকা অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে গেছে। মখমলের মতো মোলায়েম গলায় কথা বলেন ভদ্রলোক।

০৯. বাজা-ঘড়ি বা চাইমিং ক্লক

বাজা-ঘড়ি বা চাইমিং ক্লক অনেক শুনেছি, কিন্তু মহাদেব চৌধুরীর বাড়িতে ঢুকতে না-চুকতে ছটা বাজার যেসব অদ্ভুত শব্দ একটার পর একটা ঘড়ি থেকে আমাদের কানে আসতে লাগল, সেরকম ঘড়ির বাজনা আমি কোনওদিন শুনিনি। লালমোহনবাবু বললেন, এ যেন স্বর্গদ্বার দিয়ে ঢুকছি। মশাই। মাঙ্গলিক বাজছে। এ রিসেপশন ভাবা যায় না।

ঢুকতেই যে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল তা নয়। একজন কর্মচারী গোছের লোক এসে বলল, মিঃ চৌধুরী ব্যস্ত আছেন, আমাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে। আমরা একটা আপিস ঘরে গিয়ে বসলাম। এই ছোট্ট ঘরেও দুটো বাহারের ঘড়ি—একটা দেয়ালে, একটা বুকশেলফের ওপর।

ঘড়ির শব্দ থামতে এখন বাড়িটা থমথমে মনে হচ্ছে। পোল্লায় হাল ফ্যাশানের বাড়ি, পায়ের নীচে শ্বেতপাথরের মেঝেতে মুখ দেখা যায়।

একটা গলার স্বর বাড়ির ভিতর থেকে মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছি; ফেলুদা বলল সেটাই নাকি মহাদেব চৌধুরীর গলা। মখমল কি না সেটা এখান থেকে বোঝা মুশকিল, তবে এই গলাটাই যে হঠাৎ সপ্তমে চড়ে আর মখমল রইল না সেটা বেশ বুঝতে পারলাম।

মহাদেব চৌধুরী কাকে যেন বেদম ধমক দিচ্ছেন। আমরা তিনজনে প্রায় দমবন্ধ করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আড়ি পাতিছি। দ্বিতীয় ব্যক্তি গলা তুলছে না, তাই তার কথা বুঝছি না। কথা হচ্ছে ইংরিজিতে। চৌধুরীর গলায় হুমকানি শোনা গেল—

এসব ব্যাপারে। আমি অ্যাডভান্স দিই না-আপনি আত করে বললেন বলে দিলাম—আর এখন বলছেন, সে টাকা খরচ হয়ে গেছে? আপনার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না। আর এই সামান্য কাজটা করতে এত টাকা কেন লাগবে সেটাও আমি বুঝছি না। যাই হাক, আমি দিচ্ছি। টাকা, কিন্তু দুদিনের মধ্যে আমি মাল চাই। আমি কোনও অসুবিধার কথা শুনতে চাই না, বুঝেছেন?

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ, তারপর একটা জুতোর শব্দ পেলাম: মনে হল সেটা সদর দরজার দিকে চলে গেল। এক মিনিটের মধ্যেই কর্মচারীটি আবার এল।—

আপলোগ আইয়ে।

মিঃ চৌধুরীর মাথার চুল থেকে জুতোর ডগা পর্যন্ত সত্যিই মখমলের মতো। ভদ্রলোক দিনে দুবার দাড়ি কামান নিশ্চয়ই, না হলে সন্ধ্যা ছাঁটায় পুরুষ মানুষের গাল এত মসৃণ হয় না। (পরে লালমোহনবাবু বলেছিলেন, মনে হচ্ছিল গালে মাছি বসলে পিছলে যাবে)। যে বিশাল বৈঠকখানা ঘরটাতে আমরা বসেছি সেটাও মিঃ চৌধুরীর

মতোই পালিশ করা। আনাচে-কানাচে কোথাও এক কণা ধুলো বা একটাও পিপড়ে বা আরশোলা থাকতে পারে বলে মনে হয় না।

সোনার হাল্ডারে ধরা সিগারেটে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে ফেলুদার দিকে চেয়ে প্রশ্ন কললেন মিঃ চৌধুরী—

ওয়েল—ঘড়িটা এনেছেন সঙ্গে?

আমরা সকলেই অবাক; ফেলুদা তো বটেই।

ঘড়ি? কী ঘড়ি বলুন তো? প্রশ্ন করল ফেলুদা।

আপনি যে বললেন একটা ঘড়ির ব্যাপারে দেখা করতে আসছেন? আমি তো ভাবলাম আমার বিজ্ঞাপন পড়ে ফোন করছেন আমাকে।

মাপ করবেন মিস্টার চৌধুরী—আমি আপনার বিজ্ঞাপন পড়িনি। আমার একটা ব্যাপার একটু জানার দরকার হয়ে পড়েছে, সেটা সম্ভবত ঘড়ি সংক্রান্ত। শুনলাম। আপনি ঘড়ির বিষয় অনেক কিছু জানেন, তাই—

মখমলে ভাঁজ পড়েছে। ভদ্রলোক একটু যেন বিরক্তির সঙ্গেই নড়েচড়ে বসে বললেন—

আমার সময় বেশি নেই মিঃ মিটার। একটু পরেই কলকাতার বাইরে চলে যাব। আপনার কী জানার আছে সংক্ষেপে বলুন।

পেরিগ্যাল রিপিটার জিনিসটা কী সেটা জানতে চাইছিলাম।

মখমল হঠাৎ পাথর হয়ে গেল। সিগারেট হোল্ডার ঠোঁটের কাছে এসে থেমে গেছে। চোখের মণি পাথর, দৃষ্টি ফেলুদার দিকে, নিস্পলক।

আপনি কোথায় পেলেন নামটা?

উনবিংশ শতাব্দীর একটা ইংরেজি উপন্যাসে।

তার কাজের সুবিধের জন্য যে ফেলুদা অম্লানবদনে মিথ্যে কথা বলতে পারে সেটা আগেও দেখেছি। —রিপিটার যে ঘড়িও হতে পারে বন্দুকও হতে পারে সেটা অভিধানে দেখেছি, কিন্তু পেরিগ্যাল সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে পারল না।

মহাদেব চৌধুরী এখনও সেইভাবেই চেয়ে আছেন ফেলুদার দিকে। এর পরের প্রশ্নটাতে মখমলের সঙ্গে মেশানো একটা ধারালো ভাব দেখা দিল।

আপনি কি সব সময়ই কথার মানে জানতে অচেনা লোকের বাড়ি ধাওয়া করেন?

বিশেষ প্রয়োজন হলে করি বইকী।

আমি ভেবেছিলাম ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করবেন বিশেষ প্রয়োজনটা কী; কিন্তু তা না করে সেই একইভাবে ফেলুদার দিকে তাকিয়ে থেকে যে কথাটা বললেন, তাতে আমার ডান পাশের টেবিলের উপরে ঘড়িটা যেভাবে টিকটিক করছে, আমার হৃৎপিণ্ডটাও ঠিক সেইভাবেই টিকটিক করতে আরম্ভ করে দিল।

আপনি তো গোয়েন্দা, তাই না?

ফেলুদার নার্ভের বলিহারি। জবাবটা দিতে বোধহয় পাঁচ সেকেন্ড দেরি হয়েছিল, কিন্তু এল তখন তারাও গলা মখমল।

আপনি খবর রাখেন দেখছি।

রাখতেই হয় মিস্টার মিটার। খবর সংগ্রহের জন্য লোক থাকে।

আমার প্রশ্নটা বোধহয় ভুলে গেছেন। হয়তো উত্তরটা আপনার জানা নেই। আর যদি জেনেও জবাব না দিতে চান তা হলে আমি উঠি। বৃথা আপনার সময় নষ্ট করতে চাই না।

সিট ডাউন, মিস্টার মিটার।

ফেলুদা উঠে পড়েছিল, তাই এই হুকুম। লালমোহনবাবুকে দেখে মনে হচ্ছে তাঁর নিজের থেকে ওঠার অবস্থা নেই; ধরে উঠিয়ে দিতে হবে।

সিট ডাউন, প্লিজ।

ফেলুদা বসল।

রিপিটার মানে বন্দুকও হয়, বললেন মহাদেব চৌধুরী, তবে তার সঙ্গে পেরিগ্যাল যোগ দিলে সেটা হয় ঘড়ি। পকেট ওয়াচ। ফ্রানসিস পেরিগ্যাল। ইংলিশম্যান। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পেরিগ্যালের মতো ঘড়ির কারিগর পৃথিবীতে কমই ছিল। দুশো বছর আগে ইংল্যান্ডেই সবচেয়ে ভাল ঘড়ি তৈরি হত, সুইটজারল্যান্ডে নয়।

আজকের দিনে একটা পেরিগ্যাল রিপিটারের দাম কত হতে পারে?

সে ঘড়ি কেনার সামর্থ্য তো আপনার নেই মিঃ মিটার।

তা জানি।

আমার আছে।

তাও জানি।

তা হলে দাম জেনে কী হবে?

কৌতুহল।

ব্যর্থ কৌতুহল।

মিঃ চৌধুরী সিগারেটে শেষ টান দিয়ে হাল্ডার থেকে সেটা খুলে পাশে কাচের অ্যাশট্রেতে ফেলে দিয়ে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

আপনি যা জানতে চেয়েছিলেন সেটা আপনার জানা হয়ে গেছে, বললেন মিঃ চৌধুরী।এবার আপনি আসুন। পেরিগ্যাল রিপিটার কলকাতায় যেটা আছে সেটা আমিই পাব, আপনি পাবেন না।–পেয়ারেলাল!

একজন কর্মচারী এসে দাঁড়াল। সেই একই লোক—যিনি আমাদের আপিস ঘরে বসিয়েছিলেন। আমরা উঠে পড়লাম। যখন ঘর থেকে বেরোচ্ছি, তখন মখমলের মতো গলাটা আরেকবার শোনা গেল।

আমার কাছে অন্যরকম রিপিটারও আছে। মিঃ মিটার; তবে তার আওয়াজ ঘড়ির মতো সুরেলা নয়।

আপনার বর্তমান কাহিনীর নায়ক তো ইনিই বলে মনে হচ্ছে, বললেন জটায়ু।

আমরা আলিপুর পার্ক থেকে ফিরছি। গাড়ির কাচ আবার তুলে দিতে হয়েছে, কারণ বৃষ্টি। জাজেস কোর্ট রোডে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টিটা নেমেছে।

ফেলুদা লালমোহনবাবুর কথার কোনও জবাব না দিয়ে জানালার বাইরে দৃশ্য দেখতে লাগল। লালমোহনবাবু একটানা বেশিক্ষণ কথা না-বলে থাকতে পারেন না। বললেন, জানি নায়ক না বলে ভিলেন বলা উচিত, কিন্তু আপনি যে বলেন ক্রাইমের ব্যাপারে সকলকেই সন্দেহ করা উচিত-যে-কেউ ভিলেন হতে পারে–তাই আর বললুম না। অবিশ্যি সন্দেহটাও যে ঠিক কী কারণে করা উচিত, সেটা এখনও আমার কাছে পরিষ্কার নয়। কবর খোঁড়াটা কি ক্রাইমের মধ্যে পড়ে?

ফেলুদা কোনও কথারই জবাব দিচ্ছে না দেখে লালমোহনবাবু এবার অসহিষ্ণু হয়ে বললেন-ও মশাই, আপনি যে দামে গেলেন বলে মনে হচ্ছে। তা হলে আমাদের কী দশা হবে ভেবে দেখুন!! একে তো ভদ্রলোকের হাবভাব দেখে হাড়গোড় নড়বড়ে হয়ে যাবার অবস্থা। তারপরে ওই অতগুলো ঘড়ির ঢং ঢেং, আর তার উপরে আবার আপনি গুম, বাইরে বৃষ্টি, রাস্তায় গাড্ড...

এতক্ষণে ফেলুদা মুখ খুলল।

আপনার অনুমান ভুল, মিঃ গাঙ্গুলী। আমি দমিনি মোটেই। জটিল গোলকধাঁধার মধ্যে পথ পেয়ে গেলে কি লোকে দমে? বরং উলটো।

পথ পেয়ে গেছেন?

পেয়েছি, তবে পথের শেষে কী আছে তা এখনও জানি না। পথ অত্যন্ত ঘোরালো। আরও বেশ কিছুটা এগোলে পরে শেষ দেখা যাবে।

আমরা বাড়ি ফেরার পরও টিপ টপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। লালমোহনবাবু বলে গেলেন কাল সকাল সকাল আসবেন।–এ কেসটায় আমি ছাড়া আপনার গতি নেই, ফেলুবাবু! বাসট্রামে ঘোরাঘুরি করতে গেলে আপনার কত সময় লাগত ভাবুন দিকি!

আজ দুপুরে নিজামে বসে থাকতেই লক্ষ করেছিলাম, ফেলুদা তার খাতায় কী যেন হিজিবিজি কাটছে; রাত্রে খাবার পর ওর ঘরে এসে জানতে পারলাম সেটা কী ও যে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল তা নয়; এমনিতেই আমার ওর জন্য ভাবনা হচ্ছিল; মহাদেব চৌধুরীকে দেখে আর তার কথা শুনে অবধি দুশ্চিন্ত হচ্ছিল; ভদ্রলোকের মুখটা মনে করলেই কেমন জানি বুকটা কেঁপে উঠছিল। লালমোহনবাবু হিরো ভিলেন যা ইচ্ছে তাই বলুন না কেন, আমার কাছে উনি একটি ভূয়াবহ চরিত্র। বাইরেটা মখমল হলে কী হবে, ভিতরটা থর মরুভূমির কাঁটা-ঝোপের জঙ্গল।

অবিশ্যি ফেলুদাকে দেখে মনেই হল না যে তার কোনও দুশ্চিন্তা হচ্ছে। সে এখন সামনে খাতা খুলে বসে একমনে একটা নকশার দিকে দেখছে। আমি ঢুকতে এই দ্যাখ শাখাপ্রশাখা বলে খাতাটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। তাতে যে জিনিসটা আঁকা রয়েছে সেটা আমি তুলে দিচ্ছি–

ডান দিকটা কী রকম খালি-খালি লাগছে না? বলল ফেলুদা।

আমি বললাম, তা তো লাগবেই। শার্লট তো বিয়েই করেনি।

শার্লটকে নিয়ে সমস্যা নয়। সমস্যা ওই জন ব্যক্তিটিকে নিয়ে। ওই একটি শাখার বাকি অংশটা লুকিয়ে আছে। অবিশ্যি একটা জিনিস উলটা অবস্থায় দেখেছি; সেটা সোজা দেখলে পরে কিছুটা আলোকপাত হতে পারবে। অর্থাৎ কাল সকালে।

এটা ফেলুদার একটা মাকামারা হেঁয়ালি; আর যখন হেঁয়ালি করে বলছে, তখন হেঁয়ালি করবার জন্যই বলেছে।

আমাদের কথার ফাঁকেই বৃষ্টিটা থেমে গিয়েছিল। ফেলুদাকে হঠাৎ ব্যস্তভাবে বিছানা থেকে উঠতে দেখে অবাক লাগল।

বললাম, বেরোবে নাকি?

ইয়েস স্যার।

সে কী? কোথায়?

ডিউটি আছে।

কীসের ডিউটি?

পাহারা।

তার হান্টিং বুট-জোড়া বার করে রেখেছে ফেলুদা সেটা এতক্ষণ দেখিনি। ওটা দেখলেই আমার গায়ে কাঁটা দেয়, কারণ ফেলুদার প্রত্যেকটা বিখ্যাত তদন্তের সঙ্গে ওটা জড়িয়ে আছে। মাঝরাত্তিরে গোরস্থানে চলতে ফিরতে হলে ওটা ছাড়া গতি নেই।

গোরস্থানে? ধরা গলায় জিজ্ঞেস করলাম। আমি।

আর কোথায় বল!

এক যাবে?

চিন্তা নেই। সঙ্গী আছে। রিপিটার।

ফেলুদা আলমারি থেকে তার ৩২ কোল্টটা বার করে পকেটে পুরল। আমার ভাল লাগছে। না ব্যাপারটা মোটেই। বললাম, কিন্তু ওখানে কী ঘটনা ঘটবে বলে আশা করছ? কবর তো খোঁড়া হয়ে গেছে। ঘড়ি যদি পেয়ে থাকে। সে তো নিয়ে গেছে।

নেয়নি। যে বা যারা খুঁড়ছিল তারা মড়ার খুলি দেখেই ভয়ে পালিয়েছে। নইলে ওভাবে কোদাল ফেলে দিয়ে যায় না। হয় নিয়ে যাবে, না হয় লুকিয়ে রাখবে।

এ জিনিসটা আমার একেবারেই খেয়াল হয়নি।

১০. ফেলুদা ফিরেছে কখন জানি না

ফেলুদা ফিরেছে কখন জানি না। আমি যখন উঠে নীচে নেমেছি, তখন ওর ঘরের দরজা বন্ধ; তখন বেজেছে সেয়া সাতটা। বুঝলাম দু রাত না ঘুমিয়ে সকালে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে।

নটার সময় ও দরজা খুলল। ফিটফাট দাড়ি কামানো চেহারা, চোখে-মুখে কোনও ক্লান্তির ছাপ নেই। বুড়ো আঙুল নেড়ে বুঝিয়ে দিল রাত্রে কিছু ঘটেনি।

সাড়ে নটায় জটায়ু এলেন।

দেখুন তো কীরকম জিনিস।

জটায়ু তাঁর কথামতো তাঁর ঠাকুরদাদার ঘড়িটা নিয়ে এসেছেন। রুপোর ট্যাকঘড়ি, তার সঙ্গে ঝুলছে রুপোর চেন।

বাঃ, দিব্যি জিনিস, ঘড়িটা হাতে নিয়ে বলল ফেলুদা।কুককেলভির বেশ নাম ছিল এককালে।

কিন্তু সে জিনিস তো হল না—আক্ষেপের সুরে বললেন লালমোহনবাবু।এ তো কলকাতায় তৈরি ঘড়ি।

কিন্তু আপনি সত্যিই এটা আমাকে দিচ্ছেন?

উইথ মাই ব্লেসিংস অ্যান্ড বেস্ট কমপ্লিমেন্টস। আপনার চেয়ে সাড়ে তিন বছরের বড় আমি, সুতরাং আমার কাছ থেকে আশীর্বাদ নিতে আপনার আপত্তি নেই নিশ্চয়ই।

ফেলুদা ঘড়িটাকে রুমালে মুড়ে পকেটে রেখে টেলিফোনের দিকে এগোল। কিন্তু ডায়াল করার আগেই রাস্তার দিকের দরজার কড়টায় নাড়া পড়ল।

খুলে দেখি গিরীনবাবু। ইনি কাল হিন্ট দিলেও, সত্যি করে যে আসবেন, আর এত তাড়াতাড়ি আসবেন, সেটা ভাবিনি। কাজে বেরিয়েছেন সেটা বোঝা যাচ্ছে পোশাক দেখে—কোট প্যান্ট, হাতে একটা ব্রিফকেস!

টেলিফোনে দশ মিনিট ডায়াল করেও লাইন পেলাম না। কিছু মনে করবেন না। ভদ্রলোকের হাবভাব চনমনে, নার্ভাস।

মনে করবার কিছু নেই। টেলিফোন তো না থাকারই সামিল। কী ব্যাপার বলুন।

ভদ্রলোক সোফায় না বসে একটা চেয়ারে বসলেন!! আমি আর জটায়ু তক্তপোষে, ফেলুদা (ম:।

কার কাছে যাওয়া উচিত ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বললেন গিরীন বিশ্বাস, পুলিশের ওপর খুব ভরসা নেই, ফ্র্যাঙ্কলি বলছি। ঘটনাচক্রে আপনি যখন এসেই পড়লেন...

সমস্যাটা কী?

গিরীনবাবু গলা খাকরে নিলেন। তারপর বললেন, দাদার মাথায় গাছ পড়েনি।

আমরা তিনজনেই চুপ, ভদ্রলোকও কথাটা বলে চুপ।

তা হলে? প্রশ্ন করল ফেলুদা।

মাথায় বাড়ি মেরে হত্যা করার চেষ্টা হয়েছিল তাকে।

ফেলুদা শান্তভাবে চারমিনারের প্যাকেটটা ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দিলে তিনি প্রত্যাখ্যান করাতে সে নিজের জন্য একটা বার করে বলল, কিন্তু আপনার দাদা নিজে যে বললেন গাছ পড়েছিল।

তার কারণ দাদা মরে গেলেও তার নিজের ছেলের নাম প্রকাশ করবে না।

নিজের ছেলে?

প্রশান্ত। বড় ছেলে। ছোটটি বিলেতো।

কী করে প্রশান্ত?

কী না-করে সেইটে জিজ্ঞেস করুন। যত রকম গৰ্হিত কাজ হতে পারে। গত তিন-চার বছরে এই পরিবর্তন। দাদা দুই ভাইকে সমান ভাগ দিয়ে উইল করেছিল। বাউদি মারা গেছেন সেভেনটিতে। মাসখানেক আগে দাদা প্রশান্ত-র ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে তাকে শাসায়; বলে তাকে উইলচ্যুত করবে, সব টাকা সুশান্তকে দিয়ে দেবে।

প্রশান্ত আপনাদের বাড়িতেই থাকে তো?

থাকার অধিকার আছে, তার জন্য ঘর আছে আলাদা, তবে থাকে না। কোথায় থাকে বলা শক্ত। তার দল আছে। জঘন্যতম টাইপের গুণ্ডা সব। আমার বিশ্বাস সেদিন ও খুনই করে ফেলত, যদি না সাংঘাতিক ঝড়টা এসে পড়ত।

আপনার দাদা এ বিষয় কী বলেন?

দাদা বলছে সত্যই গাছ পড়েছিল। সে জেনে—শুনেও বিশ্বাস করতে চাইছে না যে তার ছেলে তার মাথার জখমের জন্য দায়ী। কিন্তু দাদা যাই বলুক না কেন—আমার নিজের ভাইপো হলেও বলছি—আপনি একটা কিছু বিহিত না করলে সে আবার খুনের চেষ্টা দেখবে।

নিরেনবাবু যদি নতুন উইল করেন তা হলে তো আর তার ছেলের তাকে খুন করে কোনও আর্থিক লাভ হবে না।

আর্থিক লাভটাই কি বড় কথা মিস্টার মিত্তির? সে তো খেপে গিয়েও খুন করতে পারে। প্রতিশোধের জন্য কি মানুষ খুন করে না?—আর দাদা উইল চেঞ্জ করবে না। তার মাথার ঠিক নেই। অপত্যস্নেহ যে কার্দুর যেতে পারে তা আপনি জানেন না মিস্টার মিত্তির। এ ক'দিন আমি বাড়িতেই ছিলাম, কিন্তু আজ আমাকে একটু কলকাতার বাইরে যেতে হচ্ছে দু-তিন দিনের জন্য, ব্যবসার কাজে। তাই আপনার কাছে এলাম। আপনি যদি ব্যাপারটা...

মিস্টার বিশ্বাস, ফেলুদা প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা ছাইটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিয়ে বলল, আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি। আমি আরেকটা তদন্তে জড়িয়ে পড়েছি। আপনার দাদার প্রোটেকশনের একটা ব্যবস্থা করা উচিত নিশ্চয়ই, কিন্তু এটাও ঠিক যে তিনি নিজেই যদি জোর গলায় বলেন যে তাঁর মাথায় গাছ পড়েছিল, তাঁকে কেউ হত্যা করার চেষ্টা করেনি—তা হলে পুলিশের বাবাও কিছু করতে পারবে না।

গিরীনবাবু অনেক'দিন-পরে-রোদ-ওঠা সকালের মেজাজটা বিগড়ে দিয়ে বিদায় নিলেন।

বিচিত্র ব্যাপার, বলে ফেলুদা সোফা ছেড়ে উঠে গিয়ে টেলিফোনে নম্বর ডায়াল করল।

হ্যালো, সুহৃদ? আমি ফেলু বলছি রে...

সুহৃদ সেনগুপ্ত ফেলুদার সঙ্গে কলেজে পড়ত এটা আমি জানি।

শোন—তোর বাড়িতে একটা প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিনের শতবার্ষিকী সংখ্যা দেখেছিলাম—তোর দাদার কপি—যদ্দূর মনে হয় পঞ্চান্নতে বেরিয়েছিল—সেটা আছে এখনও?...বেশ, ওটা তুই বেরোবার সময় তোর চাকরের হাতে রেখে যাস, আমি দশটা-সাড়ে দশটা নাগাত গিয়ে নিয়ে আসব...

আমরা চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। তিন জায়গায় যাবার আছে ফেলুদার—নরেনবাবু, বোর্ন অ্যান্ড শেপার্ড আর পার্ক স্ট্রিট গোরস্থান। নরেনবাবু শুনে একটু অবাক হলাম। ফেলুদাকে বলতে বলল, গিরীনবাবুকে মুখে যাই বলি না কেন, ওঁর কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছি না। কাজেই একবার যাওয়া দরকার। তৃতীয় জায়গাটায় তোদের না গেলেও চলবে, তবে রাত্রের পাহারাটায় আজ ভাবছি তোদের নিয়ে যাব। গোরস্থানে মাঝরাত্তিরের অ্যাটমোসফিয়ারটা অনুভব না করা মানে একটা অসামান্য অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হওয়া।

জয় মা সন্তোষী, বললেন লালমোহনবাবু। তারপর মাঝপথে একবার বললেন, মশাই, সান অফ টারজনের মতো সান অফ সন্তোষী করা যায় না?-বুঝলাম পুলক ঘোষালের অফারটা নিয়ে ভদ্রলোক এখনও ভাবা শেষ করেননি।

নরেনবাবু যদিও শরীরের দিক দিয়ে অনেকটা সুস্থ-বললেন ব্যথা-ট্যথা প্রায় সেরে গেছে, কয়েক'দিনের মধ্যেই ব্যান্ডেজ খুলবেন-তবু ওঁর। চাহনিটা ভাল লাগল না। কেমন যেন শুকনো, বিষণ্ণ ভাব।

আপনাকে শুধু দু-একটা প্রশ্ন করার আছে বলল ফেলুদা, বেশি সময় নেব না।

ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে বললেন, কিছু মনে করবেন না-আপনি কি কোনও তদন্ত চালাচ্ছেন? আপনি গোয়েন্দা জেনেই এ প্রশ্নটা করছি।

আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন, বলল ফেলুদা। সে ব্যাপারে প্রচুর সাহায্য হবে। যদি আপনি সত্য গোপন না করেন।

ভদ্রলোক চোখ বন্ধ করলেন। অনেক সময় যন্ত্রণাবোধ করলে সেটাকে সহ্য করার চেষ্টায় মানুষে যেভাবে চোখ বন্ধ করে এও সেই রকম। মনে হল উনি আন্দাজ করেছেন যে ফেলুদার জেরাটা ওঁর পক্ষে কষ্টকর হবে। ফেলুদা বলল, আপনি হাসপাতালে জ্ঞান হবার পরমুহূর্তে উইল সম্পর্কে কিছু বলতে চাইছিলেন।

নরেনবাবু সেইভাবেই চোখ বন্ধ করে রইলেন।

উইলের উল্লেখ কেন সে সম্বন্ধে একটু আলোকপাত করবেন কি?

এবার নরেন বিশ্বাস চোখ খুললেন। তার ঠোঁট নড়ল, কপিল, তারপর কথা বেরোল।

আমি আপনার কথার জবাব দিতে বাধ্য নই নিশ্চয়ই?

নিশ্চয়ই না।

তা হলে দেব না।

ফেলুদা কয়েক মুহূর্ত চুপ। আমরা সবাই চুপ। নরেনবাবু দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়েছেন!

বেশ আমি অন্য প্রশ্ন করছি, বলল ফেলুদা।

জবাব দেওয়া না-দেওয়ার অধিকার কিন্তু আমার।

একশোবার।

বলুন!

ভিক্টোরিয়া কে?

ভিক—টোরিয়া...?

এখানে বলে রাখি আমি একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছি। আপনার ব্যাগের ভিতরের কাগজপত্র আমি দেখেছি। তাতে একটি স্লিপ-এ–

ও হো! হো -ভদ্রলোক আমাদের বেশ চমকে দিয়ে হাসিতে ফেটে পড়লেন। –ও তো মান্ধাতার আমলের ব্যাপার! আমিও প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। আমি তখনও চাকরিতে। এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কাজ করত। আমাদের আপিসে—নির্টন–জিমি নর্টন। বললে তার ঠাকুমার লেখা গুচ্ছের চিঠি রয়েছে তাদের বাড়িতে। সে চিঠি আমি চাখেই দেখিনি। এই ঠাকুমা নাকি মিউটিনির সময় বহরমপুরে ছিলেন—তখন পাঁচ-সাত বছর বয়স। চিঠিগুলো পরে লেখা, কিন্তু তাতে তার ছেলেবেলার অভিজ্ঞতার কথা আছে। আজকাল তো এসব নিয়ে বই-টই খুব বেরোচ্ছে, তাই নর্টনকে বলেছিলাম কিছু বিলিতি পাবলিশারের নাম দিয়ে দেব। সে নিজে এসব ব্যাপারে একেবারে আনাড়ি দাঁড়ান-কাগজটা বার করি।

নরেনবাবু বাঁ হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপরের দেরাজটা খুলে ব্যাগ থেকে তার স্ক্রিপটা বার করলেন।

এই যে-বোর্ন অ্যান্ড শেপার্ড। ওকে বলতে চেয়েছিলুম খোঁজ করে দেখতে পারে, ওখানে ওর ঠাকুরমার কোনও ছবি পাওয়া যায় কি না। আর এই যে সব পাবলিশারের নামের আদ্যক্ষর। এ কাগজ আর তাকে দেওয়া হয়নি, কারণ নর্টনের জনডিস হয়। দেড়মাস ট্রিটমেন্টে ছিল, তারপর চাকরি ছেড়ে দেয়।

ফেলুদা উঠে পড়ল। ঠিক আছে, মিস্টার বিশ্বাস-শুধু একটা ব্যাপারে। আক্ষেপ প্রকাশ না করে পারছি না।

কী ব্যাপার?

আপনি ভবিষ্যতে কোনও লাইব্রেরির কোনও বই বা পত্রিকা থেকে কিছু হিঁড়ে বা কেটে নেবেন না। এটা আমার অনুরোধ। আসি।

ঘর থেকে বুরোবার সময় ভদ্রলোক আর আমাদের মুখের দিকে চাইতে পারলেন না।

বেণীনন্দন স্ট্রিটের সুহৃদ সেনগুপ্তের চাকর একটা ঢাউস বই এনে ফেলুদাকে দিল। প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিনের শতবার্ষিকী সংখ্যা। সেটা ফেলুদা সারা রাস্তা কেন যে এত মন দিয়ে দেখল, আর দেখতে দেখতে কেন যে বার তিনেক বোঝে ব্যাপারখানা বলল সেটা বুঝতে পারলাম না।

বোর্ন অ্যান্ড শেপার্ডে ঢুকে ফেলুদা দশ মিনিটের মধ্যে একটা বড় লাল খাম নিয়ে বেরিয়ে এল। দেখেই বোঝা যায় তার মধ্যে বড় সাইজের ফোটা রয়েছে।

কীসের ছবি আনলেন মশাই? জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু।

মিউটিনি, বলল ফেলুদা। আমি আর লালমোহনবাবু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। ফেলুদার কথার মানে ছবিগুলো নর্ট ফর দ্য পাবলিক।

গোরস্থানে আর আপনাদের ভেতরে টানব না; আমি শুধু দেখে আসি সব ঠিক আছে কি না।

আমরা গাড়িটা ঘুরিয়ে গোরস্থানের ঠিক সামনেই পার্ক করলাম। ফেলুদা যখন গেট দিয়ে ঢুকাল, তখন দেখলাম দারোয়ান বরমদেও বেশ একটা বড় রকমের সেলাম ঠুকল!

দশ মিনিটের মধ্যে ফেলুদা ফিরে এসে ওকে বলে গাড়িতে উঠল। ঠিক হল রাত সাড়ে দশটায় আমরা আবার এখানে ফিরে আসছি।

আমার মন বলছে আমরা নাটকের শেষ অঙ্কের দিকে এগিয়ে চলেছি।

১১. ফেলুদার সঙ্গে এতবার এত জায়গায় ঘুরেছি

ফেলুদার সঙ্গে এতবার এত জায়গায় ঘুরেছি। রহস্যের পিছনে পিছনে-সিকিম, লখনী, রাজস্থান, সিমলা, বেনারস-কেনিওখানেই অ্যাডভেঞ্চারে কমতি পড়েনি; কিন্তু এই কলকাতাতে বসেই এমন একটা রক্ত-হিমা-করা রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়তে হবে এটা কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবিনি।

বিশেষ করে আজকের দিনটা, লালমোহনবাবু যেটার নাম দিয়েছিলেন ব্ল্যাক-লেটার ডেযদিও সেটাকে আবার পরে বদলিয়ে করলেন ব্লক-লেটার নাইট। আর পার্ক স্ট্রিট সেমেট্রিরি সম্বন্ধে বলেছিলেন, ছেলেবেলায় মেজো জ্যাঠা বুঝিয়েছিলেন। ওটাকে বলে গোরস্থান, কারণ ওখানে গোরাদের সমাধি আছে! এখন মনে হচ্ছে নামটা হওয়া উচিত গেরোস্থান। এমন গেরোয় এর আগে পড়িচি কখনও তপেশ? তোমার মনে পড়চে?

সত্যি বলতে কী, অনেক ভেবেও মনে করতে পারিনি।

লালমোহনবাবু এমনিতেই পাংচুয়াল; গাড়ি হবার পর মেজাজটা আরও মিলিটারি হয়ে গেছে। আগে কড়া নাড়তেন, আজ দেখি নক করলেন। আমরা দুজনেই খেয়েদেয়ে তৈরি হয়ে বসেছিলাম। আজ ফেলুদার সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও হান্টিং বুট পরতে হয়েছে। আমারটা গত বছর কেনা, ওরটা এগারো বছরের পুরনো। বোধহয় অবস্থাটা খুব ভাল নয় বলে বিকেলে দেখেছিলাম ও নিজেই সুকতলায় কী সব মেরামতের কাজ করছে। এখন একটু খোঁড়াচ্ছে দেখে মনে হল মুচি ডাকিয়ে কাজটা করালেই ভাল হত। এই বিপদের রাতে খোঁড়ালে চলবে কেন?

দরজায় টাকা পড়তেই আমরা উঠে পড়লাম। ফেলুদার কাঁধে খয়েরি রঙের শান্তিনিকেতনি ঝোলা, তার ভিতর থেকে লাল খামের খানিকটা বাইরে বেরিয়ে রয়েছে। এখানে বলে রাখি, ওরই হুকুমমাফিক আজ আমরা সকলে গাঢ় রঙের পোশাক পরেছি। লালমোহনবাবু পরেছেন একটা কালো টেরিকটের সুট।

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকেই বললেন, মডার্ন মেডিসিন কোথায় পৌঁছে গেল মশাই!—একটা নতুন নার্ভ-পিল বেরিয়েছে—নামটায় আবার দুটো এক্স—ভবেন ডাক্তারের সাজেশনে ডিনারের পরে একটা খেয়ে নিলুম-এরই মধ্যে সমস্ত শরীরে বেশ একটা কলপ-দেওয়া ফিলিং হচ্ছে। তপেশ ভাই, যা থাকে কপালে—লড়ে যাব, কী বলো? কীসের সঙ্গে লড়বেন সেটা অবিশ্যি উনিও জানেন না, আমিও জানি না।

ফেলুদা আগেই ঠিক করেছিল গাড়িটা গোরস্থানের গেট থেকে বেশ কিছুটা দূরে রাখবে— গাড়ির রংটা আপনার আজকের পোশাকের সঙ্গে ম্যাচ করলে অতটা চিন্তা করতাম না। সেন্ট জেভিয়ার্স ছাড়িয়ে রাডন স্ট্রিটের মোড়ের একটু আগেই ও গাড়িটা থামাতে বলল। তোরা এগিয়ে যা। গাড়ি থেকে নেমে বলল ফেলুদা, আমি হরিপদবাবুকে কয়েকটা ইনস্ট্রাকশন দিয়ে আসছি।

আমরা এগিয়ে গেলাম। ফেলুদা কী ইনস্ট্রাকশন দিল জানি না, কিন্তু এটা জানি যে হরিপদবাবু এ ক'দিন আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে আর কথাবার্তা শুনে রীতিমতো উৎসাহ পেয়ে গেছেন। এটা ওঁর হাবেভাবে বেশ বোঝা যায়।

মিনিট তিনেকের মধ্যেই ফেলুদা ফিরে এল। বলল, আপনার লাক ভাল মিঃ গাঙ্গুলী যে আপনি এমন একটি ড্রাইভার পেয়েছেন। ভদ্রলোককে কাজের দায়িত্ব দিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

কী দায়িত্ব দিলেন মশাই?

এদিকে গণ্ডগোল না হলে কোনও দায়িত্ব নেই, আর হলে ওঁর উপর বেশ খানিকটা ভরসা। রাখতে হবে।

এর বেশি আর ফেলুদা কিছু বলল না।

লোহার ফটকের সামনে পৌঁছে দেখি সেটা খোলা। ফেলুদাকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করাতে ও ফিসফিস করে উত্তর দিল যে এমনিতে এ সময় খোলা থাকে না। কিন্তু আজ সেটার ব্যবস্থা করা হয়েছে।পাঁচিলের উপর কাচ বসানো, টপকানো রিসকি, তাই এই ব্যবস্থা। কিন্তু বরামদেও আছেন কি?

দারোয়ানের ঘরে টিমটিম করে বাতি জ্বলছে, কিন্তু সেখানে কেউ আছে বলে মনে হল না। আমরা ঘরের আশপাশটা ঘুরে দেখলাম। কেউ নেই। পার্ক স্ট্রিট থেকে আসা ফিকে আলোতে দেখতে পাচ্ছি ফেলুদার ভ্রকুটি। বুঝলাম দারোয়ানের সঙ্গে যা ব্যবস্থা হয়েছিল তাতে ওর থাকবার কথা।

আমরা এগিয়ে গেলাম। আজ আর মাঝখানের সেই পথটা দিয়ে নয়। সেটা দিয়ে কয়েক পা গিয়েই ফেলুদা বাঁয়ে ঘুরল। আমরা সমাধির ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এগোতে লাগলাম। বাতাস বইছে বেশ জোরে। আকাশে ফালি ফালি মেঘের স্রোত। তার ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে ফিকে আধা-চাঁদটা উঁকি মেরেই আবার লুকিয়ে পড়ছে। সেই চাঁদের আলোতে ফলকের নামগুলো এই আছে এই নেই। এই আলোতেই বুঝলাম আমরা স্যামুয়েল কাথবার্ট থর্নহিলের সমাধিতে আশ্রয় নিলাম। এটা সরু হয়ে উঠে যাওয়া ওবেলিস্ক নয়। এর নীচে বেদি, বেদির উপর চারিদিকে ঘিরে থাম আর মাথায় গম্বুজ। তিনজন লোকে দিব্যি ঘাপটি মেরে থাকতে পারে। এখানে আলো পৌঁছায় না, তবে সুবিধে এই যে ডান দিকে চাইলে অন্য সমাধির ফাঁক দিয়ে লোহার। ফটকের একটা অংশ দেখা যায়।

এ গোরস্থান এখন আমরা ছাড়া কেউ থাকতে পারে না ভেবেই ফেলুদা মুখ খুলল; তবে গলা তুলল না।

এটা ছড়িয়ে দিন তো একটু আশেপাশে।

ফেলুদা ঝোলা থেকে একটা ছিপি-আঁটা বোতল বার করে লালমোহনবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়েছে।

ছোছ্-ছড়িয়ে?

কার্বলিক অ্যাসিড। সাপ আসবে না। চারদিকে হাত চারেক দূর অবধি ছিটিয়ে দিলেই হবে। লালমোহনবাবু আজ্ঞা পালন করে এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এসে বললেন, যাক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। সাপের ভয়টা মশাই নার্ভ-পিলেও যায় না।

ভূতের ভয় গেছে?

টোট্যালি।

ব্যাঙ ডাকছে। ঝিঁঝি ডাকছে। একটা ঝিঁঝি বোধহয় আমাদের পাশের কবরেই আস্তানা গেড়েছে। চলন্ত মেঘের এক-একটা খণ্ড বোধহয় একটু বেশি ঘন বলেই অন্ধকারটা হঠাৎ হঠাৎ গাঢ় হয়ে উঠছে। তার ফলে সমাধিগুলো তালগোল পাকিয়ে চোখের সামনে একটা জমাট বাঁধা অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আবার যেই চাঁদ বেরোচ্ছে আমনি সমাধিগুলোর এক পাশে আলো পড়ে সেগুলো পরস্পর থেকে আলগা হয়ে যাচ্ছে।

ফেলুদা পকেট থেকে চিকলেট বার করে আমাদের দিয়ে নিজে দুটো মুখে পুরল।

গাড়ির শব্দ ক্রমেই কমে আসছে। এক দুই তিন করে সেকেন্ড গুনে হিসাব করে দেখলাম একটানা প্রায় আধ মিনিট ধরে ব্যাঙ ঝিঝি আর দমকা হাওয়ায় পাতার সরসর ছাড়া আর কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

মিডনাইট, চাপা স্বরে লালমোহনবাবু বললেন।

মিডনাইট কেন বললেন? আমি দু মিনিট আগে হাত বাড়িয়ে আমার রিস্টওয়াচে চাঁদের আলো ফেলিয়ে দেখেছি বেজেছে এগারোটা পাঁচিশ। জিজ্ঞেস করাতে বললেন, না, এমনি বলছি। মিডনাইটের একটা বিশেষ ইয়ে আছে তো!

কী ইয়ে?

গোরস্থানে মিডনাইট তো!—তাঁর একটা বিশেষ ইয়ে আছে। কোথায় যেন পড়িচি।

তখনই ভূত বেরোয়?

লালমোহনবাবু কয়েকবার এক্স এক্স বলে শেষের বার এক্স-এর সটাকে সাপের মতো কিছুক্ষণ টেনে রেখে চুপ মেরে গেলেন। আমার পাশে একটা প্রায়-শোনা-যায়-না খচ শব্দ থেকে বুঝলাম ফেলুদা হাতের আড়ালে দেশলাই জ্বালাল। তারপর হাতের আড়ালেই একটা চারমিনার ধরিয়ে হাতের আড়ালেই টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল।

আকাশে মেঘ বাড়ছে। গাড়ির আওয়াজ হাওয়া। হাওয়ার আওয়াজ হাওয়া। সব সাড়া, সব শব্দ শেষ। কাছের বিপ্লবি ঠাণ্ডা! আমার শরীর ঠাণ্ডা, গলা শুকনো। ঠোঁট চোটে ঠোঁট ভিজাল না।

চী-এর পরে একগাদা ঋ-ফলা দিয়ে একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল। এক সঙ্গে দুটো থাপ্পড়ের আওয়াজে বুঝলাম। লালমোহনবাবু হাত দিয়ে হাইস্পিডে কানি ঢাকলেন। ফেলুদা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

একটা গাড়ি থেমেছে। কতদূরে, সেটা এত রাত্রে বোঝা যাবে না। দরজা বন্ধর শব্দ। মন বলছে শব্দটা উত্তরে পার্ক স্ট্রিট থেকে নয়, পশ্চিমের রীড়ন স্ট্রিট থেকে। ওদিকে গেট নেই, পাঁচিল আছে; পাচিলের উপর কাচ বসানো।

আমাদের চোখ তবু লোহার গেটের দিকে। লালমোহনবাবু মুখ খুলতে যাচ্ছিলেন, ফেলুদা আমার কাঁধের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে ওঁর কাঁধে চাপ দিয়ে থামিয়ে দিল।

কিন্তু কেউ তো আসছে না গেটের দিকে।

হয়তো গাড়ি অন্য কোথাও অন্য কারণে থেমেছে! কত বাড়ি তো রয়েছে চারপাশে। হয়তো কেউ নাইট-শো দেখে ফিরল। আশা করি তাই, তা হলে আর এ-গাড়িটা নিয়ে ভাববার কিছু থাকে না।

ফেলুদা কিন্তু সটান দাঁড়িয়ে আছে, পিছনের দেয়ালের সঙ্গে সেঁধিয়ে। তার সামনেই একটা থাম। চারিদিকে বাদুড়ে অন্ধকার। কেউ দেখতে পাবে না। আমাদের।

কিন্তু আমরা তাদের দেখব কী করে? যদি তারা এসে থাকে?

দেখবার দরকার নেই। একটু পরেই সেটা বুঝতে পারলাম। চোখের দরকার নেই। কাজ করবে। কাম।

ঝুপ...ঝুপ...ঝুপ...ঝুপ...

মাটি খোঁড়ার শব্দ। কিছুক্ষণ চলল শব্দ। আমরা রুদ্ধশ্বাসে শুনছি।

ঝুপ...কুপ...

শব্দ থেমে গেল।

একটা আলো! দুরে দুটো ওবেলিস্কের ফাঁক দিয়ে ঘাসের উপর ক্ষীণ আলো। প্রতিফলিত আলো।

আলোটা স্থির নয়-দুলছে, নড়ছে, খেলছে। টর্চের আলো।

এবার নিভে গেল।

পাঁচিল টপকে এসেছে দাঁত চিপে মন্তব্য করল ফেলুদা। তারপর বলল, ফিলো করব। বুঝলাম আবার গাড়ির আওয়াজের অপেক্ষা করছে ফেলুদা।

এক মিনিট।

দু মিনিট, তিন মিনিট, চার মিনিট।

স্ট্রেঞ্জ! বলল ফেলুদা!

কোনও শব্দ আসছে না। আর পার্ক স্ট্রিট থেকে। রাড়ন স্ট্রিট থেকেও না। যে গাড়িটা এসেছিল। সেটা থেমেই আছে। তা হলে?

আরও দু মিনিট গেল। আবার মেঘে ফাটল। চাঁদ বেরোল। কেউ কোথাও নেই।

ধর এটা–

ফেলুদা তার ঝোলাটা আমায় দিয়ে ঘাসে নামল। যেদিকে আলোটা দেখেছিলাম সেদিকে এগিয়ে গেল। ভয় নেই-ওর পকেটে কোল্ট ৩২। মন বলছে। শিগগিরই তার গর্জনে এই গোরস্থানের জমাট নিস্তব্ধতা খান-খান হতে চলেছে। কিন্তু -পা যে খোঁড়া ওর! সামান্য হলেও খোঁড়া। কেন যে সর্দারি করে নিজে জুতো সারাতে গেল জানি না।

কিন্তু কই? কোল্টের গর্জন?

ভুল করলেন, ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন জটায়ু। তোমার দাদা ভুল করলেন।

আর যেন কথা না বলেন। তাই আমি জিভে দিয়ে সাপের শব্দ করে ওকে থামিয়ে দিলাম! ফেলুদা কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। কী ঘটছে ওই সমাধিস্তম্ভগুলোর মধ্যে কিছুই বুঝতে পারছি না। একটা শব্দ পাওয়া গেল কি? কানের ভুল নিশ্চয়ই।

মিডনাইট? এটা কোন ঘড়ি? সেন্ট পলস? হাওয়া ওদিক থেকেই। পশ্চিমে হাওয়া হলে রাত্তিরে আলিপুরের চিড়িয়াখানার সিংহের গর্জন শোনা যায় আমাদের বালিগঞ্জের বাড়ি থেকে।

ওই যে গাড়ির শব্দ।

দরজা বন্ধ হল। স্টার্ট নিল। তারপর হুস।

আর বসে থাকা যায় না! ভয় করছে না; শুধু ভাবনা।

উঠে পড়লাম দুজনেই। লালমোহনবাবুর বিড়বিড়ানিতে কান দেব না; সময় নেই।

এগিয়ে গেলাম দ্রুত পায়ে। মেরি এলিসের কবর। কবরের দেয়ালে হাত ঘষে ঘষে এগোচ্ছি। জটায়ু আমার শার্ট খামচে আছেন পিছন থেকে। পায়ের তলায় ঘাস এখনও ভিজে, এখনও ঠাণ্ডা।

জন মাটিনের কবর। সিনথিয়া কোলেট। ক্যাপ্টেন এভানস। এবার একটা ওবেলিস্ক। কালো ফলকের উপরে—

খচ্–

পায়ের তলায় কী জানি পড়ল। মৃদু শব্দ করে চোপটে গেল। পা সরিয়ে নীচের দিকে চাইলাম। চাঁদের আলো রয়েছে। হাতে তুলে নিলাম জিনিসটা।

চারমিনারের প্যাকেট।

খালি না। অনেক সিগারেট রয়েছে ভিতরে। সব চ্যাপটা। ফেলুদা—

আর কিছু মনে নেই।–কেবল মুখের উপর একটা চাপ, আর লালমোহনবাবুর এক চিলতে আর্তনাদ।

১২. পুরীর সমুদ্রের ধারে

জ্ঞান হয়ে প্রথমেই মনে হল পুরীর সমুদ্রের ধারে রয়েছি। এত হাওয়া সমুদ্রের ধারেই হয়। কান ঠাণ্ডা, নাক ঠাণ্ডা, চুল উড়ছে।

কিন্তু জল কোথায়? বালি? ঢেউ কোথায়? এ গর্জন তো ঢেউয়ের গর্জন নয়; এ তো চলন্ত গাড়ির শব্দ। অন্ধকারের মধ্যে খোলা রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছি আমরা। গাড়ির পিছনে বসে আছি আমি। আমি মাঝখানে, ডান পাশে লালমোহনবাবু, বাঁয়ে যে লোক তাকে চিনি না, দেখিনি কখনও সামনে ড্রাইভারের মাথায় পাগড়ি, তার পাশে আরেকটা লোক। কেউ কথা বলছে না।

একটু মাথা তুলতেই পাশের লোকটা ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। আধা-গুণ্ডা টাইপের চেহারা। কোনও ধমক দিল না। কেন দেবে? আমাদের ভয় করার তো কোনও কারণ নেই। আমাদের কাছে কোনও হাতিয়ার নেই। হাতিয়ার ফেলুদার কাছে। সে এ গাড়িতে নেই। সে কোথায় জানি মা!

কিন্তু ফেলুদার সেই ঝোলাটা?

আমার মাথার পিছনে, কাচের সামনের তাকষ্টায়! ঝোলার স্ট্র্যাপটা আমার গালের পাশ অবধি ঝুলে আছে।

মিডনাইট, পাশ থেকে বলে উঠলেন জটায়ু। আমি আড়াচোখে দেখলাম ওঁর চোখ এখনও বোজা।

মিডনাইট, মা!!–জয় মা, মা সন্তোষী!...মিডনাইট...

বকো মৎ! পাশের লোক শাসাল।

আবার ঝিমুনি। আবার অন্ধকার। গাড়ির শব্দ মিলিয়ে এল...

এর পর আবার যখন চোখ খুলল। তখন মন বলছে দেখব কোনও মন্দিরের ভিতর বসে। আছি। না, মন্দির না-গির্জা। এ তো পিতলের দিশি ঘণ্টা নয়। এ-সুর বিলিতি!

কিন্তু দেখলাম। এটা মন্দির নয়। এটা বৈঠকখানা। মাথার উপর ঝাড় লণ্ঠন, তবে সেটা জ্বলছে না। ঘরে আলো বেশি নেই–কেবল একটা ল্যাম্প। সেটা একটা মখমলে মোড়া সোফার পাশে একটা টেবিলের উপর রাখা। আমিও বসে আছি মখমলের সোফায়। বসে না; আধ-শোয়া। আমার পাশেই লালমোহনবাবু। তাঁর চোখ বন্ধ। আমার ডান দিকে পরের সোফাটায় বসে আছে ফেলুদা। তার মুখ গভীর। তার কপালের ডান দিকে একটা অংশ কালো হয়ে ফুলে আছে। বাঁয়ে আমাদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে একটা লোক, যাকে আমরা পেয়ারেলাল বলে চিনি। তার হাতে রিভলভার। কোল্ট৩২। নির্ঘাত ফেলুদারটা।

আরও তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে আমাদের দিকে মুখ করে। কেউ কোনও কথা বলছে না। কথা বলার লোক বোধহয় এখনও আসেনি। আমাদের সামনে সবচেয়ে যে বড় সোফা, যার মখমলের রং কালো, সেটা এখনও খালি। মনে হয় সেটা কারুর অপেক্ষায় রয়েছে। বোধহয় মিস্টার চৌধুরী। কিন্তু এটা আলিপুরের কোনও হালের বাড়ি নয়। এ বাড়ি আদ্যিকালের। এর সিলিং বিশ হাত উঁচু। লোহার কড়িবারগা। এর দরজা দিয়ে ঘোড়া ঢুকে যায়।

আরও আছে। ঘড়ি। ঝুলোনো আর দাঁড়ানো ঘড়ি। তার মধ্যে একটা প্রায় দেড় মানুষ উঁচু, আমার ডান দিকে। এই ঘড়িগুলোই বাজছিল একটু আগে। এখনও মাঝে মাঝে বেজে উঠছে। রাত দুটো।

ফেলুদার সঙ্গে একবারই চোখাচৌখি হয়েছে। ওর চোখের ভাষাটা আমি জানি বলেই ভরসা। পেয়েছি। ওর চোখ বলছে ঘাবড়াসনি, আমি আছি।

গুড মার্নিং, মিস্টার মিটার।

বিলিতি নিয়মে রাত বারোটার পরেই মর্নিং।

ভদ্রলোককে দেখতে পাইনি, কারণ ল্যাম্পের ঠিক পিছন দিকের দরজা দিয়ে ঢুকেছেন। এখনও মখমল। আগের বার যা দেখেছিলাম তার চেয়েও বেশি। না হবার কোনও কারণ নেই। এখন উনি আপ, ফেলুদা ডাউন।

ওতে কী আছে। পেয়ারেলাল? ওটা সার্চ করা হয়েছে ভাল করে?

ভদ্রলোকের চোখ গেছে ফেলুদার ঝোলার দিকে। ওটা যে কখন ফেলুদার কাছে চলে গেছে জানি না।

পেয়ারেলাল জানাল যে ওতে বই খাতা আর ছবি ছাড়া আর কিছু নেই। একটা বোতল ছিল, সরিয়ে রাখা হয়েছে।

কিছু মনে করবেন না। এইভাবে ধরে আনার জন্য-গলায় একটু বেশি পালিশ দিয়ে ফেলুদাকে উদ্দেশ করে কথাটা বললেন মিঃ চৌধুরী। ভাবলাম পেরিগ্যাল রিপিটার সম্পর্কে যখন আপনার এতই কৌতুহল, তখন জিনিসটা আমার হাতে এসে পড়ার মুহূর্তে আপনি থাকলে হয়তো খুশিই হবেন।-কেয়া বলওয়ন্ত, সাফা হুয়া ঘড়ি?

একজন ভৃত্য মাথা নেড়ে বলল, ঘড়ি সাফা হয়ে এল, এক্ষুনি আসবে।

টু হান্ড্রেড ইয়ারস গ্রেভের মধ্যে পড়েছিল, বললেন মিঃ চৌধুরী।উইলিয়াম এ কথাটা আগে আমাকে বলেনি। বলেছে তার কাছে পেরিগ্যাল ঘড়ি আছে। অথচ আনিব-আনব করে দেরি করছে। তারপর চাপ দিতে বলল ঘড়ি আছে মাটির নীচে তাই দেরি হচ্ছে। ডেডবডির পাশে পড়েছিল। তাই বললাম বুরুশ দিয়ে ঝাড়ন দিয়ে সাফা না করে আমার কাছে আনবে না। ভেটিলের পোঁছ দিয়ে দেবার কথাও বলেছি।

ফেলুদা সটান চেয়ে আছে মিঃ চৌধুরীর দিকে। মুখ দেখে তার মনের ভাব বোঝার উপায় নেই। আমাদের ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করেছিল; ওকে মাথায় বাড়ি মেরে।

আপনি কোত্থেকে জানলেন এ ঘড়ির কথা মিঃ মিটার? প্রশ্ন করলেন মহাদেব চৌধুরী।

উনবিংশ শতাব্দীর একটা ডায়রি থেকে। যার ঘড়ি তার মেয়ের ডায়রি।

ডায়ারি? চিঠি না?

না, ডায়রি।

মিঃ চৌধুরী তার বিলিতি সিগারেটের প্যাকেটটা বার করেছেন পকেট থেকে, আর সেইসঙ্গে সোনার লাইটার আর সোনার হোল্ডার।

আপনার সঙ্গে উইলিয়ামের পরিচয় নেই? হাল্ডারে সিগারেট ঢোকালেন মিঃ চৌধুরী।

উইলিয়াম নামে আমি কাউকে চিনি না।

ফস্ করে মিঃ চৌধুরীর ডানহিল। লাইটার জ্বলে উঠল।

তা হলে ওই ডায়রি পড়েই আপনার ঘড়িটার উপর লোভ হয়েছিল?

লোভ জিনিসটা তো আপনার একচেটিয়া, মিঃ চৌধুরী।

মখমলের উপর মেঘের ছায়া। দুই আঙুলে ধরা হাল্ডারটা ঈষৎ কাঁপছে।

আপনি মুখ সামলে কথা বলবেন, মিঃ মিটার!

সত্যি কথা বলতে আমি মুখ সামলাই না, মিঃ চৌধুরী। আমার উদ্দেশ্য ছিল ঘড়ি যাতে গডউইনের কবরেই থাকে; আপনার মতো লোকের হাতে—

ফেলুদার কথা শেষ হল না। একজন লোক হাতে একটা সিল্কের রুমালের উপর একটা জিনিস। এনে মিঃ চৌধুরীকে দিল। চৌধুরী জিনিসটা হাতে তুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে আমার পাশ থেকে একটা গোঙানির শব্দ উঠিল—

আঁ... আঁ... আঁ... আঁম্...

লালমোহনবাবুর জ্ঞান হয়েছে, আর হয়েই মিঃ চৌধুরীর হাতের জিনিসটা দেখেছেন। জিনিসটা তিনি খুব ভাল করেই চেনেন।

মিঃ চৌধুরীর অবস্থা যে কী হল সেটা আমার পক্ষে লিখে বোঝানো খুব মুশকিল। ফেলুদাকেই বলতে শুনেছি যে গানের সাত সুর আর রামধনুর সাত রঙের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে, কিন্তু একটা মানুষের গলায় আর মুখে এত

কম সময়ে এত রকম সুর আর এত রকম রং খেলতে পারে সেটা ভাবতে পারিনি। গালাগাল যা বেরোল মানুষটার মুখ দিয়ে সেটা শোনা যায় না, বলা যায় না, লেখা যায় না। ফেলুদা অবিশ্যি নির্বিকার। আমি বুঝতে পারছি এটা তারই কীর্তি, কাল যখন দুপুরে দশ মিনিটের জন্য সে গোরস্থানে ঢুকেছিল তখনই সে এ কাজটা করে এসেছে। কিন্তু আসল ঘড়ি কি তা হলে নেই?

কুককেলভির ঘড়িটাকে মিঃ চৌধুরী উন্মাদের মতো ছুড়ে ফেলে দিলেন তার ডান পাশে খালি সোফাটার দিকে। আর তার পরেই তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—

উইলিয়াম সাহাবকে বোলাও!—আর উয়ো রিভলভার দেও হামকো!

পেয়ারেলাল রিভলভারটা মিঃ চৌধুরীর হাতে দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মিঃ চৌধুরী দু-একবার স্কাউণ্ড্রল সুইন্ডলার ইত্যাদি বলে সোফা ছেড়ে উঠে অত্যন্ত অসহিষ্ণু ভাবে পায়চারি শুরু করলেন।

এবার পেয়ারেলাল সেই পিছনের দরজাটা দিয়ে আরেকটা লোককে সঙ্গে নিয়ে ঢুকল। আবছা অন্ধকারে দেখলাম কাঁধ অবধি লম্বা মাথার চুল আর ঠোঁটের দুপাশে ঝুলে থাকা গোঁফ। পরনে প্যান্ট, শার্ট আর সুতির কোটি।

কী ঘড়ি নিয়ে এসেছ তুমি কবর খুঁড়ে? বর্জগভীর গলায় প্রশ্ন করলেন মিঃ চৌধুরী। তিনি আবার সোফায় গিয়ে বসেছেন, তার হাতে এখনও রিভলভার, দৃষ্টি এখনও ফেলুদার দিকে।

যা পেয়েছি। তাই এনেছি, মিঃ চৌধুরী—আগন্তুক কাতর স্বরে জবাব দিল।আপনাকে ঠকিয়ে কি আমি পার পাব? আপনি এত বড় এক্সপার্ট!

তা হলে সে চিঠির কথা কি মিথ্যে? ঘর কাঁপিয়ে প্রশ্ন করলেন মহাদেব চৌধুরী।

তা কী করে জানব মিঃ চৌধুরী? ওটার উপর ভরসা করেই তো সব কিছু। এই তো সেই চিঠি—দেখুন না।

আগন্তুক একটা পুরনো চিঠি বার করে মিঃ চৌধুরীর হাতে দিল। চৌধুরী সেটায় চোখ বুলিয়ে বিরক্তভাবে সেটাকেও ছুড়ে ফেলে দিলেন পাশের সোফার উপর, আর ঠিক সেই সময় হেসে উঠল ফেলুদা। প্রাণখোলা হাসি। এমন হাসি ওকে অনেক'দিন হাসতে দেখিনি।

হাসির কী পেলেন। আপনি মিঃ মিটার? গির্জন করে উঠলেন মহাদেব চৌধুরী। কোনওমতে হাসিটাকে একটু চেপে ফেলুদা উত্তর দিল—

আপনার এত নাটকীয় আয়োজন সব ভেস্তে গেল দেখে হাসি পেল, মিঃ চৌধুরী।

চৌধুরী রিভলভার হাতে আবার সোফা ছেড়ে উঠে পুরু কর্পেটের উপর দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে এগিয়ে এলেন ফেলুদার দিকে।

আমার নাটক কি শেষ হয়ে গেছে ভাবছেন, মিঃ মিটার? আসল ঘড়ি যে আপনার কাছে নেই তার কী বিশ্বাস? আপনি তো গোরস্থানে অনেকবার গেছেন। আজও তো উইলিয়ামের আগে আপনি পৌঁছেছেন। আপনার কাছে ঘড়ি থাকলে সে ঘড়ি হাত না করে কি আমি ছাড়ব? আপনি যেখানে সেটা লুকিয়ে এসেছেন সেখান থেকে আপনাকেই সেটা বার করে দিতে হবে মিঃ মিটার। আর ঘড়ি যদিও নাও থেকে থাকে–এই চিঠি যদি মিথ্যে হয়ে থাকে–তা হলেও যে আমি আপনাকে ছেড়ে দেৰ এটা কী করে ভাবছেন? আপনার সব ব্যাপারে নাক গলানোর অভ্যাসটা যে আমার পক্ষে বড় অসুবিধাজনক, মিঃ মিটার! কাজেই, নাটক ফুরিয়েছে কী বলছেন? নাটক তো সবে শুরু!

ফেলুদার গলায় এবার আমার একটা খুব চেনা সুর দেখা দিল। এটা ও নাটকের চরম মুহূর্তে ব্যবহার করে। লালমোহনবাবু বললেন, এ সূরটা নাকি ওঁকে তিব্বতি শিঙার কথা মনে করিয়ে (।

আপনি ভুল করছেন, মিঃ চৌধুরী। নাটক এখন আমার হাতে, আপনার হাতে নয়। এই মুহূর্ত থেকে আমি নাটকট চালাব। আমিই বিচার করব আপনাদের দুজনের মধ্যে কার অপরাধ বেশি-আপনার, না যিনি উইলিয়াম বলে–

ঘরে তোলপাড় ব্যাপার! উইলিয়াম একটা প্রচণ্ড লাফ দিয়ে তার সামনে দাঁড়ানো পেয়ারেলালকে এক ঘুষিতে ধরাশায়ী করে বাইরের দরজার দিকে ধাওয়া করেছে। চৌধুরীর রিভলভারের গুলি তাকে হাত দু-একের জন্য মিস করে দরজার বা দিকের একটা দাঁড়ানো ঘড়ির কাচের ডায়াল খানখান করে দিল; আর সবাইকে অবাক করে সেই সঙ্গে শুরু হয়ে গোল সেই জখম ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি।

মিস্টার উইলিয়ামকে ধরতে আরও দুজন লোক ছুটছে; কিন্তু তারা বেশি দূর যেতে পারল না। তাদের পথ আটকেছে কয়েকজন সশস্ত্র লোক। তারা এবার উইলিয়াম সমেত সকলকে নিয়ে বৈঠকখানায় এসে ঢুকাল। সামনের ভদ্রলোককে দেখে বলে দিতে হয় না। ইনি একজন পুলিশ ইনস্পেক্টর। সঙ্গে আরও পাঁচজন পুলিশ কনস্টেবল ইত্যাদি, আর সবার পিছন দিয়ে সংগ্রহে উঁকি দিচ্ছেন লালমোহনবাবুর ড্রাইভার হরিপদ দত্ত।

সাবাস, হরিপদবাবু, বলল ফেলুদা।

আপনিই তো ফেলুমিত্তির? ঠিক লোকের দিকে চেয়েই প্রশ্নটা করলেন ইনস্পেক্টর মশাই! কী ব্যাপার বলুন তো? মিঃ চৌধুরীকে তো চিনি-কিন্তু ইনি কে, যিনি পালাচ্ছিলেন?

ফেলুদা এর উত্তর দেবার আগে হতভম্ব মহাদেব চৌধুরীর হাত থেকে নিজের রিভলভারটি অনায়াসে বার করে নিয়ে বলল, থ্যাঙ্ক ইউ, মিঃ চৌধুরী-এবার আপনি কাইন্ডলি আপনার নিজের জায়গায় গিয়ে বসূন তো। নাটকের বাকি অংশটা দেখার সুবিধে হবে। আর তা ছাড়া আপনাকে কালো মখমলে মানায় বড় ভাল। আর মিস্টার উইলিয়াম-ফেলুদার দৃষ্টি ঘুরে গেছে—আপনার চুল আর গোঁফটাতে কিন্তু আপনাকে হুবহু আপনার প্রপিতামহের মতো দেখাচ্ছে ও দুটো খুলবেন কি দয়া করে?

পুলিশ টান দিতেই উইলিয়ামের গোঁফ আর পরচুলা খুলে এল, আর অবাক হয়ে দেখলাম উইলিয়ামের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন নরেন বিশ্বাসের ভাই গিরীন বিশ্বাস!

এবার বলুন তো মিঃ বিশ্বাস, বলল ফেলুদা, আপনার পুরো নামটা কী?

কেন; আমার নাম আপনি জানেন না?

আপনার এখন দুটো নাম জানা যাচ্ছে। এই দুটো জুড়েই বোধহয় আপনার আসল নাম, তাই না? উইলিয়াম গিরীন্দ্রনাথ বিশ্বাস-তাই না? অন্তত প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিনে গোলন্ড মেডালিস্টদের তালিকায় তো তাই বলছে। আর আপনার ভাইয়ের নাম বলছে মাইকেল নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। ভিজিটিং কার্ডের এম'টা হয়ে যাচ্ছে মাইকেল, তাই না? আপনারা বাংলা নামটা ব্যবহার করতেন বলেই বোধহয় নরেনবাবু ভিজিটিং কার্ডে এম. এন না ছেপে এন. এম ছেপেছিলেন-তাই না?

গিরীনবাবু চুপ! বোঝাই যাচ্ছে ফেলুদা ঠিকই বলেছে।

আপনার দাদা আপনাকে কী বলে ডাকেন, মিঃ বিশ্বাস?

তাতে আপনার কী প্রয়োজন?

আপনি যখন বলবেন না, তখন আমিই বলছি। উইল উইল বলে ডাকেন আপনার দাদা। হাসপাতালে জ্ঞান হবার পর তিনি আপনারই নাম উচ্চারণ করেছিলেন। দুবার–তাই না?

এবার ফেলুদা লাল খামটা থেকে একটা বড় ছবি টেনে বার করল।দেখুন তো গিরীনবাবু এদের চেনেন কি না! এ ছবি হয়তো আপনাদের বাড়িতেও নেই। কিন্তু বোর্ন অ্যান্ড শেপার্ডে ছিল।

স্বামী-স্ত্রীর ছবি; যাকে বলে ওয়েডিং গ্রুপ; ভদ্রলোকের চেহারার সঙ্গে গিরীনবাবুর চেহারার আশ্চর্য মিল! আর ভদ্রমহিলা মেমসাহেব।

ফেলুদা বলল, চিনতে পারছেন। এঁদের? ইনি হচ্ছেন পার্বতীচরণ–অর্থাৎ পি সি বিশ্বাস, আপনার প্রপিতামহ। ইনি যে ক্রিশ্চান হয়েছিলেন সেটা তো এর পোশাক দেখেই বোঝা যাচ্ছে। আর এই মহিলাটি হচ্ছেন টমাস গডউইনের নাতনি-ওই চিঠিটা যিনি লিখেছেন তিনিভিক্টোরিয়া গডউইন। এর কুমারী অবস্থার ছবিও বোর্ন অ্যান্ড শেপার্ডে রয়েছে। এই ভিক্টোরিয়া আপনার প্রপিতামহের মতো একজন নেটিভ ক্রিশচীনকে ভালবেসে তার ঠাকুরদাদার বিরাগভাজন হয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যুশয্যায় টম গডউইন ভিক্টোরিয়াকে ক্ষমা করে যান। তার এক বছর পরেই পার্বতীচরণ ভিক্টোরিয়াকে বিয়ে করেন। তার মানে হচ্ছে এই যে, কলকাতায় একটি নয়, দুটি পরিবারের সঙ্গে টম গডউইনের নাম জড়িত রয়েছে-একটি রিপন লেনে, আরেকটি নিউ আলিপুরে। আর আশ্চর্য এই যে, দুজনের কাছেই এমন দলিল রয়েছে যাতে টমাসের ঘড়ির উল্লেখ রয়েছে। এক হল ভিক্টোরিয়ার এই চিঠি, আর আরেক হল টমাসের মেয়ে শার্লট গডউইনের ডায়রি।

আশ্চর্য ঘটনা! গল্পকে হার মানায়। ভিক্টোরিয়ার লেখা চিঠির একটা তাড়া বহুকাল থেকে নাকি নরেনবাবুদের বাড়িতে রয়েছে। পুরনো। ট্রাঙ্কের মধ্যে, কিন্তু কেউ গরজ করে পড়েনি। পুরনো কলকাতা নিয়ে লিখতে শুরু করার পর নরেনবাবু চিঠিগুলো পড়েন। তখনই টমাস গডউইনের ঘড়ির ঘটনাটা জানতে পারেন, আর ভাইকে সে সম্বন্ধে বলেন।

গিরীনবাবু ফেলুদার জেরার ঠেলায় কাহিল, কিন্তু এখনও তাকে রেহাই দেবার সময় আসেনি। ফেলুদা হঠাৎ প্রশ্ন করল–

আপনার কি রেসের মাঠে যাবার অভ্যোস আছে, মিঃ বিশ্বাস?

ভদ্রলোক কিছু বলার আগে মিঃ চৌধুরী খোঁকিয়ে উঠলেন।

আমার কাছ থেকে টাকা আগাম নিয়ে সব ঘোড়ার পিছনে খুইয়েছে, আর এখন কবর খুঁড়ে কুককেলভির ঘড়ি এনে হাজির করেছে।–অকর্মা কোথাকার!

ফেলুদা চৌধুরীর কথায় কান না দিয়ে গিরীনবাবুকেই উদ্দেশ করে বলে চলল, তার মানে টম গডউইনের একটি গুণ আপনি পেয়েছেন!! আর সেই কারণেই বোধহয় এত বড় একটা ঝুকি নিয়েছিলেন?

উত্তরটা এল বেশ ঝাঁজের সঙ্গে।

মিঃ মিত্তির, আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে, একশো বছর পেরিয়ে গেলে কবরের ভিতরের কোনও জিনিসের উপর কোনও ব্যক্তিবিশেষের আর কোনও অধিকার থাকে না। ওই ঘড়িটা এখন আর টম গডউইনের সম্পত্তি নয়।

সেটা জানি মিঃ বিশ্বাস। ও ঘড়ি সরকারের সম্পত্তি, আপনারও নয়। কিন্তু কথাটা হচ্ছে, আপনার অপরাধ তো শুধু ঘড়ি চুরির চেষ্টা নয়, অন্য অপরাধও যে আছে।

কী অপরাধ? গিরীন বিশ্বাস এখনও একগুয়ে ভাব করে চেয়ে আছেন ফেলুদার দিকে।

এবার ফেলুদা তার পকেট থেকে ছোট্ট একটা জিনিস বার করল।

দেখি তো, এই বোতামটা আপনার ওই কোটটা থেকেই পড়েছে কি না-যে কোটটা আপনি এই দুদিন আগে হংকং লক্তি থেকে নিয়ে এলেন।

ফেলুদা বোতাম নিয়ে এগিয়ে গেল।

এই দেখুন, মিলে যাচ্ছে।

তাতে কী প্রমাণ হল? প্রশ্ন করলেন গিরীনবাবু।এটা খুলে পড়ে যায় গোরস্থানে। আমি তো অস্বীকার করছি না যে সেখানে গিয়েছিলাম।

আমি যদি বলি এটা আপনার কোট নয়, আপনার দাদার কোট, তা হলে স্বীকার করবেন কি?

কী আবোল-তাবোল বকছেন আপনি?

আকোল-তাবোল আমি বকিছি না, মিঃ বিশ্বাস, আপনি বকছেন। কাল আমার বাড়িতে এসে বকেছেন, আবার এখানে বকছেন। এ কোটি আপনার দাদার। এটা পরে তিনি গোরস্থানে গিয়েছিলেন। সেই ঝড়ের দিন। গিয়ে দেখেন গ নর কবর খোঁড়া হচ্ছে, আপনি রয়েছেন। তিনি আপনাকে বাধা দিতে যান। আপনি তার মাথায় বাড়ি মারেন-কলাঠি বা ওই জাতীয় কিছু দিয়ে। নরেনবাবু অজ্ঞান হয়ে পড়েন। আপনি হয়তো তাকে মেরেই ফেলতেন, কিন্তু সেই সময় ঝড়টা আসে। আপনি পালাতে যান। গাছ পড়ে-

গিরীনবাবু আবার বাধা দিলেন।

আমার দাদাকে আপনি মিথ্যেবাদী বানাতে চান? তিনি বলেছেন তাঁর মাথায় গাছের ডাল-

কিন্তু ফেলুদার কথা আটকানো এখন সহজ নয়। সে বলেই চলল—

গাছের ডাল ভেঙে পড়ে আপনার পিঠে। আপনার গায়ে কোট ছিল না। পিঠের জখম ঢাকবার জন্য আপনি দাদার কোটি খুলে নিজে পরেন। কেটের বোতাম ছিঁড়ে যায়, পকেট থেকে। মানিব্যাগ পড়ে যায়। আপনার নিজের পকেট থেকে রেসের বই—

গিরীনবাবু আবার পালাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। এবার ফেলুদাই তাঁকে ধরে তাঁর কোটটা খুলে দিয়ে দেখিয়ে দিল তাঁর টেরিলিনের শার্টের নীচে ব্যান্ডেজটা।

আপনার দাদা আপনাকে বাঁচাবার জন্য অনেক মিথ্যে বলেছেন গিরীনবাবু, কারণ তিনি আপনাকে অত্যন্ত বেশিরকম স্নেহ করতেন।

ফেলুদা এবার তার ঝোলাটায় কুককেলভির ঘড়িটা আর ভিক্টোরিয়ার চিঠিটা ভরে নিয়ে, সেটা কাঁধে নিয়ে হতভম্ব মিঃ চৌধুরীর দিকে ফিরে বলল, আপনার সব ঘড়িতে এক সঙ্গে বারোটা বাজলে কেমন শোনায়, সেটা শোনার আর সুযোগ হল না। হবে হয়তো এক'দিন।

তিনবার ডাকার পর জটায়ু উঠলেন। তিনি যে এর ফাঁকে আবার হুশ হারিয়ে নাটকের আসল দৃশ্যটাই মিস করে গেছেন সেটা এতক্ষণ বুঝতে পারিনি।

***

এসব লোককে দাবিয়ে রাখা যায় না রে। পুলিশও কিছু করতে পারে না। মহাদেব চৌধুরীর মতো লোকগুলো হল এক-একটা হিটলার। কাজ গুছিয়ে নিতে এরা কত লোককে যে টাকার জোরে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখে তার ঠিক নেই।

আমরা তিনজনে পেনেটির গঙ্গার ঘাটে এসে বসেছি। চৌধুরীর বাড়ি থেকে মিনিট পাঁচেকের পথ এই ঘাট। পূব আকাশের রং দেখে মনে হচ্ছে সূর্য এই উঠল বলে! হরিপদবাবু অক্ষরে অক্ষরে ফেলুদার নির্দেশ পালন না করলে আজ আমাদের কী দশা হত। জানি না তো। (লালমোহনবাবু বললেন গঙ্গাপ্রাপ্তি)। একজন লোকের কতখানি দায়িত্বজ্ঞান থাকলে, তবে আমাদের গাড়ির পিছনে ধাওয়া করে এসে সটান গিয়ে থানায় খবর দেয়, সেটা ভাবতে অবাক লাগছে। লালমোহনবাবু, হরিপদবাবুরই এনে দেওয়া ভাঁড়ের চায়ে একটা চুমুক দিয়ে বললেন, গাড়ি কেনার ফলটা আশা করি টের পেলেন?।

মোক্ষমভাবে, বলল ফেলুদা। আপনার গাড়ির উপর অনেক অত্যাচার হয়েছে এই তিন দিনে। আজ শহরে ফিরে দুটো জায়গায় যাবার পর আর বেশ কিছুদিন ও গাড়ির ওপর জুলুম করব না।

দুটো জায়গা মানে?

এক হল নীরেনবাবুর বাড়ি। তাকে খবরটা আর সেই সঙ্গে এই চিঠিটা ফেরত দেওয়া দরকার।

আর দ্বিতীয়?

সাউথ পার্ক স্ট্রিট গোরস্থান।

আ-হাবা-র!

কী সাবধানে পা ফেলতে হয়েছে জানিস তোপ্‌সে? এর জন্যে জুত করে লড়তে পারলাম না লোকগুলোর সঙ্গে!

ফেলুদা তার বাঁ পায়ের হান্টিং বুটটা খুলে তার ভিতর হাত ঢুকিয়ে প্রথমে বার করল তার তৈরি ফলস সুকতলা, যার তলায় খোপ, যার মধ্যে তুলোর মোড়কে লুকিয়ে আছে একটি আশ্চর্য জিনিস, এত হুলস্থূল কাণ্ডের মধ্যেও যার শুধু কাচটি ছাড়া আর সবই অক্ষত, অটুট রয়েছে।

এটা যথাস্থানে ফেরত দিতে হবে না?

ফেলুদার হাতে ঝুলছে টমাস গডউইনকে তার রান্নার জন্যে দেওয়া লখনী-এর নবাব সাদাত আলির প্রথম বকশিশ-ইংল্যান্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারিগর ফ্রানসিস পেরিগ্যালের তৈরি রিপিটার পকেট ঘড়ি-দুশো বছর তার মালিকের কঙ্কালের পাশে ভূগর্ভে থেকেও যার জৌলুস, সূর্যের প্রথম আলোতে এখনও আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।